কয়লা

শ্রীগৌরগোপাল সরকার

কয়লা

শ্রীগৌরগোপাল সরকার

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। সংখ্যা ১১০

প্রকাশ ১৩৬১ আশ্বিন

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
শৈলেন প্রেস। ৪ সিমলা স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

৩'১

ভূমিকা

বইখানির পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি ; এতে সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় কয়লা সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত মূল বিষয়গুলিকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে।

এটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীগৌর-গোপাল সরকার সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন বলে মনে করি।

জ্বালানি গবেষণাগার
জিয়ালগোড়া, মানভূম

শ্রীআদিনাথ লাহিড়ী

সূচীপত্র

॥ মলাটের চিত্র ॥

বোকারো কয়লা-অঞ্চলের একটি পুকুর-খাদ

কয়লার অবদান

চোখ থাকতেও দেখার মধ্যে যে মস্তবড় ফাঁক থেকে যায় সেটা বুঝতে পারি তখনই যখন হঠাৎ কেউ জানতে চায়, যে ঘরটায় কুড়ি বছর কাটিয়েছি তার নিখুঁত বর্ণনা, কিংবা যে সিঁড়ি বেয়ে দশ বছর ওঠানামা করেছি তার সংখ্যা। অথচ জীবনের প্রতিটি স্তরে এই নিত্যনৈমিত্তিক দেখাকে ভালো ভাবে দেখার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার, শিল্পের সৃষ্টি অথবা সাহিত্যের সমৃদ্ধি। মজার কথা এই যে, আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জনের মুখও মাঝেমাঝে আমরা স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি না।

কিন্তু দেখতে পাওয়ার সঙ্গে যদি আমরা দেখতে চাই, তা হলে এ ফাঁকটা আর থাকে না। সত্যদৃষ্টি দিয়েই বোঝা যায় সৃষ্টির অপূর্ব সমন্বয়— অসুন্দর ও অপ্রয়োজনীয় পদার্থও আমাদের চোখে হঠাৎ সুন্দর ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

কাঠ ও কয়লার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। যদি বলা যায় এ পরিচয় আজকের নয়— প্রাগৈতিহাসিক কালের, তা হলেও ভুল হবে না। আদিম জীবনযাত্রার প্রধান সহায়ক এই কাঠ ও কয়লার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আজও আমাদের অটুট আছে। বৈদ্যুতিক অথবা আণবিক শক্তির বহুল ব্যবহার না হওয়া পর্যন্ত এরা আমাদের পরমহিতৈষী হয়েই থাকবে।

কয়লাকে চেনে না এমন লোক খুবই কম। সাধারণত তাপশক্তির উৎপাদক হিসাবেই কয়লা সকলের কাছে আদর পায়। রান্নাকাজের সঙ্গেই কয়লার সম্পর্ক প্রতিদিনের হয়ে রয়েছে। গরম চা, গরম ভাজা যেমন কয়লার জন্যই সম্ভব হয়, তেমনি শীতের দিনে কয়লার তাপ অথবা স্নানের গরম জল পাবার সময় কয়লারই শরণাপন্ন হতে হয়। শহরের সৌষ্ঠব বড় বড় অট্টালিকা-

গুলিকে পাকা করবার ভার এই কয়লাকেই নিতে হয়েছে। এমনকি কড়ি বরগা চুন ও সিমেণ্ট পর্যন্ত কয়লার পরোক্ষ দান। কিন্তু আধুনিক জগতে কয়লা এর চেয়ে আরও অনেক বেশি উপকার করে।

কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায় তার দ্বারা জল বাষ্পে রূপান্তরিত হয় এবং এই বাষ্পীয় শক্তিই নানাভাবে যান্ত্রিক শক্তিরমূল উৎস রূপে কাজ করে।

যদি বলা যায় যে, খাদ্য জল ও বাতাস আমাদের দেহপুষ্টি ও কর্মশক্তির জন্য যে পরিমাণে দায়ী, একটি ট্রেন অথবা জাহাজ চালাবার জন্যও কয়লা জল ও বাতাস সেই পরিমাণে দায়ী, তা হলে অত্যুক্তি হবে না।

কয়লার এই তাপশক্তিকে বাষ্পশক্তিতে এবং তা থেকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে যে কত সহস্র কাজ করানো হয়, আমরা তার বিবরণ জানি এবং প্রতিনিয়ত দেখছি। বড় বড় কারখানা ও কলগুলো চালু রাখতে যে শক্তির প্রয়োজন তার অধিকাংশ কয়লা থেকেই পাওয়া যায়। বাড়ির বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ অথবা রাস্তার ট্রামগাড়ি চালানোর জন্য এই কয়লাই অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। কয়লার গ্যাস দিয়ে আলো জ্বালানো হয় অথবা রান্নাও করা চলে।

অধিকাংশ ধাতুনিষ্কাশন কয়লার সাহায্যেই হয়ে থাকে। যে লৌহ ও ইস্পাত দ্বারা আমাদের আধুনিক সভ্যতার পরিচায়ক বিস্তৃত রেলপথ এঞ্জিন কারখানা-গৃহ জলপোত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম গঠন সম্ভবপর হয়েছে তা নিষ্কাশনের জন্য পুরোপুরিভাবে কয়লার মুখাপেক্ষী হতে হয়।

এ ছাড়াও কয়লা থেকে প্রস্তুত নানাপ্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য, উৎকৃষ্ট রঞ্জক দ্রব্য, সুবাসিত তরল সার, এবং কীটপতঙ্গ প্রতিষেধক দ্রব্যাদি মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধন করছে।

কয়লালব্ধ বেঞ্জল এবং উদজান (Hydrogen) সহযোগে কয়লা থেকে প্রাপ্ত ঘটিত-পেট্রোল (সিন্‌থেটিক্ পেট্রোল) সমানভাবে খনিজ পেট্রোলিঅমের স্থান অধিকার করেছে।

অ্যামোনিয়া তৈয়ারির প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে যে সোরাজান(Nitrogen) ও উদজানের প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে হলে উত্তপ্ত কোকের মধ্য দিয়ে জলীয় বাষ্প ও বাতাসের সংমিশ্রণ পাঠানো হয় এবং পরে সংশ্লিষ্ট অপ্রয়োজনীয় গ্যাসগুলি অপসারণ করা হয়। এই উপায়ে প্রস্তুত অন্যান্য প্রকার গ্যাস, তাপ- বৈদ্যুতিক- অথবা যান্ত্রিক- শক্তির আধার কিংবা বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্যের মূল উপাদান রূপে কাজ করে।

কয়লার অক্টোপাস আমাদের জীবনযাত্রাকে যে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে একটি সামান্য দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যায়। পাহাড়ি অঞ্চলের এক চাষভূমি দেখবার জন্য আমরা মোটরে রওনা হলাম। মোটরের 'বার্নিশ' সামান্য কয়েক দিন আগে দেওয়া হয়েছে। পোকার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গদির কোণে 'ন্যাপথ্যালিন' রাখা আছে। পরদার 'রং' বেশ বাহারের। প্রয়োজনীয় 'পেট্রোল' সঙ্গেই নেওয়া হল। রওনা হবার হুদিন আগে ব্যাটারির 'অ্যাসিডে' চার্জ দেওয়া হয়েছিল। 'পীচ'ঢালা রাস্তার হুপাশেই 'গ্যাস'লাইটের পোস্ট, 'বিস্ফোরক' দ্রব্য দিয়ে পাহাড় কেটে এই রাস্তা বানানো হয়েছে। অনেকখানি এগিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য এক সরাই-খানায় ঢুকলাম। কাঠের তৈরি সরাইখানা। তার উপর 'আলকাতরা'র প্রলেপ। বৃষ্টি বাদল অথবা কীটজনিত ক্ষয় নিবারণের জন্যই এই ব্যবস্থা। সরাইএর আবেষ্টনী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মশামাছির উপদ্রব কমাবার জন্য আশপাশের নালীতে নিয়মিতভাবে 'ফিনাইল' ও 'ডি-ডি-টি' ছড়ানো হয়। 'কার্বলিক' সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আমরা সেখানে 'সুগন্ধি'যুক্ত সরবৎ খেয়ে আবার যাত্রা শুরু করলাম। সেখানেও দেখি চিনির অভাবে 'স্যাকারিন' ব্যবহার করা হচ্ছে। এর পর গন্তব্যস্থলে পৌছতে বিশেষ দেরি হল না। চাষভূমিটি দেখে বড় আনন্দ পাওয়া গেল—বিশেষ নীরস পাহাড়ের কোলে সোনার ফসল এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। ট্রাকটার দিয়ে চাষ দেওয়া হচ্ছে, আর সেই

অমানুষিক শক্তির মূল যোগানদার হল 'ঘটিত-পেট্রোল'। 'অ্যামোনিয়া'-সার সে মাটিকে করছে উর্বর, আর পাহাড়ি নদীর জল পাম্পের সাহায্যে বাহিত হয়ে সে মাটির তৃষ্ণা করছে দূর। আমাদেরও চোখের পিপাসা মিটল, যে পথ দিয়ে গিয়েছিলাম সে পথেই আবার ফিরে এলাম। কিন্তু এই যাওয়া-আসার বর্ণনায় যেসব বস্তুর নাম উধ্ব´ কমার (' ') ভিতর দেখানো হল তারা যে কয়লারই অবদান সে কথা যেন না ভুলি।

তাই আজকের দিনে খনিজ সম্পদ হিসাবে কোন্ দেশের কয়লার পরিমাণ কতখানি তা দিয়েই সেখানকার সৌভাগ্যের মান নির্ণীত হয়। এই বিচারে যদিও আমেরিকা পৃথিবীর প্রায় শতকরা ষাট ভাগ কয়লার অধিকারী হবার সৌভাগ্য পেয়েছে, তবু প্রয়োজনের তাগিদ অনুসারে ভারতের ভাগ্যও খুব খারাপ নয়। কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কয়লা-উৎপাদনকারী হিসাবে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

১৯৩৭ সালের ফিস্‌কাল কমিশনের হিসাব অনুসারে ২০০০ ফুট গভীরে সে সময় যেসকল কয়লার স্তর বা বেড আছে বলে জানা গিয়েছিল তার মোট পরিমাণ ৬৫০০ কোটি টন। তার পর এই গত ১৭ বৎসরে আরও অনেক কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় কয়লার সঠিক পরিমাণ ও বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক বিভাগ সম্পূর্ণ সচেষ্ট রয়েছেন।

ইণ্ডিয়ান কোল্‌ফিল্ডস্ কমিটির ১৯৪৬ সালের রিপোর্ট অনুসারে উৎকৃষ্ট কোকিং কয়লার (ধাতুনিষ্কাশনের উপযোগী কয়লার) পরিমাণ মাত্র ৭৫ কোটি টন। বর্তমান হারে খরচ করলে এ কয়লা আগামী ৬০ বৎসরের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কোকিং কয়লা ব্যতীত বাকি কয়লা যা আছে তার তৃতীয়াংশের বেশি বর্তমান খনন-ব্যবস্থায় খনি থেকে তোলা যাবে বলে মনে হয় না। কয়লা খরচের বর্তমান হারে হিসাব করলে এর দ্বারা আগামী ছয়-সাত শত বৎসর পর্যন্ত ভারতের চাহিদা মেটানো সম্ভবপর

হবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট নন্-কোকিং কয়লার আয়ু তার বহু পূর্বেই নিঃশেষ হবে।

আমাদের এই চিরপরিচিত পরমহিতৈষী 'কালো হীরা'কে (black diamond) না জানলে চলবে কেন? তাকে ভালোভাবে জেনে, তার সদ্ব্যবহার করেই আমরা দেশের সমৃদ্ধিসাধন করতে পারি। বিশেষভাবে আজকের দিনে, ভারতের স্বাধীনতালাভের পর শিল্পপ্রসার যখন একান্ত প্রয়োজনীয়, তখন শিল্পশক্তির মূল উৎস এই কয়লার তত্ত্ব ও তথ্য আমাদের ভালো ভাবেই সংগ্রহ করতে হবে।

কয়লার জন্ম

বিশ্বসৃষ্টির এবং বিশ্বশক্তির জনয়িতা হিসাবেই সূর্যের অপর নাম সবিতা। এ কথা যে কত বড় সত্য এবং নিয়ত ধ্বংস ও সৃষ্টির মাঝে প্রকৃতির তুলাদণ্ড যে কিভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলেছে কয়লার ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়েই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্ এবং বিবর্তনবাদীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, সৃষ্টির ইতিহাসে উদ্ভিদ প্রাণীর অগ্রজ। কোটি কোটি বৎসর আগে পৃথিবীতে এমন দিন ছিল যেদিন উদ্ভিদেরই ছিল রাজত্ব। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে উচ্চশ্রেণীর বিশালকায় বৃক্ষসমূহ বংশানুক্রমে পৃথিবীতে রাজত্ব করে এসেছে। এইসঙ্গে প্রাণীদেহের আবির্ভাব যে ঘটেনি তা নয়, তবে তাদের বাহুল্য ছিল না। উদ্ভিদের দেহগঠন বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণা এইসঙ্গে মনে রাখা ভালো।

ক্ষার জাতীয় কয়েকটি পদার্থ, সোরা (নাইট্রেট) এবং উদ্ভিদের দেহগঠন-উপযোগী আরও কয়েকটি লবণ মাটি থেকে শিকড় দিয়ে রস টানার সঙ্গেই উদ্ভিদদেহে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় অঙ্গারাম্ল

গ্যাস (carbon dioxide gas), যা উদ্ভিদ সোজাসুজি বাতাস থেকে গ্রহণ করে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়। সূর্যালোক ছাড়া সবুজ রঙের উদ্ভিদের দেহগঠন শুরু হতে পারে না। লোহিত কণিকার জন্য আমাদের রক্ত যেমন লাল, তেমনি ক্লোরোফিল নামক এক প্রকার সবুজ কণিকার জন্য উদ্ভিদের দেহ সবুজ। এই সবুজ কণিকাগুলিই শেষ পর্যন্ত 'আধমরাদের ঘা দিয়ে বাঁচা'বার ব্রত গ্রহণ করে। জল ও অঙ্গারাম্ল গ্যাস, ক্লোরোফিল ও সূর্যালোকের সহযোগে কার্বোহাইড্রেটে (লিগ্নিন ও সেলিউলোজে) পরিণত হয় এবং উদ্বৃত্ত অম্লজান (oxygen) বাতাসে ফিরে আসে। এইসঙ্গে কৌশলী ক্লোরোফিলের জাদুস্পর্শে সূর্যরশ্মির অনেকখানি শক্তি এই কার্বোহাইড্রেট পদার্থের সঙ্গে উদ্ভিদদেহে বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়। এই শক্তির কিয়দংশ এবং কার্বোহাইড্রেট পদার্থের অংশ-বিশেষ উদ্ভিদের নিজ প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। সূর্যের এই বন্দীপ্রাপ্ত শক্তি উদ্ভিদ-জাতীয় খাদ্যের মধ্য দিয়েই আমাদের শরীরে শক্তিসঞ্চার করে, অথবা পরোক্ষভাবে প্রাণীদের মাধ্যমে এই শক্তি খাদ্যের সঙ্গে আমিষভোজী মানবশরীরে প্রবেশ করে। মাধ্যম পরিবর্তনে এবং উক্ত মাধ্যমের স্বীয় প্রয়োজনে এই শক্তির পরিমাণ অবশ্য ক্রমেই হ্রাস পায়। আমাদের নিয়ত চলাফেরা এবং কাজের মাঝেই আমরা এই শক্তির ব্যবহার করি। সেজন্য খাদ্যকে আমাদের দেহ-কারখানার জ্বালানি বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই সূর্যকে সবিতা আখ্যা দেওয়া খুবই বিজ্ঞানসম্মত।

কোটি কোটি বৎসর আগে উদ্ভিদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য এইভাবেই বিস্তার-লাভ করেছিল; কোথাও বা নিবিড় জঙ্গল, কোথাও বা লতাগুল্ম, ফুল ও ফলের মেলা। কিন্তু মাঝেমাঝে ঘটত বিপর্যয়। পৃথিবীর বুকে স্থানে স্থানে প্লাবনের বেগে কিংবা ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে কাদামাটি এবং জলের নীচে এইসব অরণ্যের জীবন্তসমাধি ঘটত। ক্রমশ কাদা-মাটির স্তর ধীরে ধীরে বেড়ে গিয়ে এইসব সমাধিস্থ গাছপালা বহুযুগের

ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে আর পৃথিবীর উপরকার চাপ এবং আভ্যন্তরীণ তাপের ফলে স্তরীভূত পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হল। যেখানে স্বস্থানেই দারুব্রহ্মের এই রূপান্তর হয়েছে বিজ্ঞানীরা সে কয়লাকে বলেন 'coal of in situ origin' বা স্বস্থানজ কয়লা।

আবার আর-এক ভাবেও কয়লা উৎপন্ন হয়েছে। সেকালে ভূত্বকের নানা বিপর্যয়ে কখনো কখনো দূর দেশ থেকে বনজঙ্গল ও উদ্ভিদ জলের তোড়ে ভেসে এসে নদীর উপত্যকা, অববাহিকা, সমুদ্রের মোহানা, হ্রদ ইত্যাদিতে চাপা পড়ে গিয়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছিল। দূর দেশে গিয়ে দারুব্রহ্মের এই রূপান্তর যেখানে হয়েছে, বিজ্ঞানীরা সে কয়লাকে বলেন. 'coal of drift origin' অথবা অনুবাহিক কয়লা। ভূতাত্ত্বিকদের মতে ভারতের অধিকাংশ কয়লা এই শ্রেণীভুক্ত।

মাটির ক্ষারজাতীয় পদার্থ উদ্ভিদের দেহগঠনের জন্য প্রয়োজন এবং দ্রবীভূত অবস্থায় জলের সঙ্গে তা উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করে। এর ফলে মাটির ক্ষারজাতীয় পদার্থ ক্রমেই নিঃশেষিত হয়। এই ক্ষারহীন মাটিকেই সচরাচর কয়লাখনির নিম্নস্তরে ফায়ার ক্লে (fire clay) অথবা 'অগ্নিসহ মৃত্তিকা' রূপে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই অগ্নিসহ মৃত্তিকা স্বস্থানজ কয়লার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। উদ্ভিদের মূলের চিহ্নও মাঝেমাঝে এর ভিতর পাওয়া যায়।

নানা শ্রেণীর স্থলীয় প্রাণী এবং গাছপালার দেহাবশেষ অর্থাৎ ফসিল (fossil) বা জীবাশ্মও কয়লা-খনিতে দেখা যায়। এর দ্বারা কয়লার বয়স, উৎপত্তির কারণ এবং উদ্ভিদ-বিষয়ক অনেক তথ্য মোটামুটি জানা যায়।

এখন অনেকের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে এখনও যেসব খড়কুটো লতাপাতা ফুলফল প্রভৃতি ভেসে গিয়ে সমুদ্রে অথবা হ্রদে পড়ছে, তাতে কি কয়লার সৃষ্টি হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু মাত্র বলা যায়

যে, উদ্ভিদ থেকে সম্পূর্ণ কয়লায় রূপান্তরের পথে peat নামক যে এক প্রকার বস্তু উৎপন্ন হয়, সুন্দরবন ইত্যাদি পৃথিবীর অঞ্চল বিশেষে সেই বস্তু বর্তমানে সৃষ্ট হয়ে চলেছে। তবে সেকালের সে আবহাওয়া ও উদ্ভিদের সে রাজত্বও আর নেই, ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনও ঘন ঘন ঘটছে না। তাই আজকের এইসব মুষ্টিমেয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে যদি কয়লায় রূপ নেয়, তা হলেও সেই স্বল্পপরিমাণ কয়লা সে যুগের মানুষের বিশেষ কোনো উপকারে আসবে না। তা ছাড়া আণবিক শক্তির চাইতেও ভয়ংকর যে শক্তি সেদিন তাদের কাছে আসবে তার কাছে কয়লার কোনো মূল্যই হয়তো থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু জেনে রাখা ভালো যে, কৃত্রিম চাপ ও তাপের দ্বারা সেলিউলোজ থেকে গবেষণাগারে কয়লার সমতুল্য বস্তু প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

কয়লার বর্ণভেদ

কয়লা কি, এই কথার উত্তরে একজন বৈজ্ঞানিক খুব সহজ ভাষায় জানিয়েছেন—'Coal is a stratified rock of mummified plants'—অর্থাৎ কয়লা হল মমিগ্রস্ত উদ্ভিদের স্তরীভূত শিলা। ভূগর্ভস্থ তাপ, উপরিস্থ পাথরমাটির চাপ এবং অবস্থানকালের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কয়লার সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের বিভিন্নতাও এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের মত ভূগর্ভের এই কয়লাকেও অ্যান্থ্রাসাইট (anthracite), বিটুমিনাস্ (bituminous), লিগনাইট (lignite) ও পীট (peat) এই চতুর্বর্ণে ভাগ করা হয়। এর ভিতর অ্যানথ্রাসাইট এবং বিটুমিনাসই প্রকৃত কয়লা।

বৈদিক সমাজের বর্ণাশ্রমে শূদ্রকে যেমন অধম বলে গণ্য করা হত,

তেমনি কয়লার প্রথম অবস্থা পীটকেও অধমশ্রেণীভুক্ত বলা হয়। লাল আভাযুক্ত অথবা ধূসর রঙের এই পীট অনেক স্থানে পাওয়া যায় এবং সাধারণত এগুলি শ্যাওলা (moss) প্রভৃতি জলজ অথবা জলাভূমিজাত উদ্ভিদ থেকেই সৃষ্ট হয়। এর মধ্যে জলীয় ভাগ ও অম্লজান সবচয়ে বেশি। আসল কয়লার তুলনায় অঙ্গারকের (carbon) ভাগ এতে খুবই কম, জিনিসটি বেশ নরম এবং হালকা। আমাদের দেশের সুন্দরবন এলাকায় পীট-সমতুল্য বস্তুর সন্ধান মেলে।

পীটের উৎকৃষ্টতর পরিণতি লিগনাইটে প্রকট হয়। ধূসর অথবা কৃষ্ণাভ এই লিগনাইটে জলীয় অংশ এবং অম্লজান পীট অপেক্ষা কম হলেও বিটুমিনাস অথবা অ্যান্থ্রাসাইট অপেক্ষা বেশি এবং অঙ্গারকের ভাগ এই দুইএর অনুপাতে কম। লিগনাইটও বেশ হালকা। ভারতের পাঞ্জাব মাদ্রাজ বিকানীর এবং কচ্ছ প্রভৃতি স্থানে এই লিগনাইট পাওয়া যায়। অধুনা মাদ্রাজ অঞ্চলে প্রচুর লিগনাইটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

লিগনাইটের পরবর্তী উচ্চ অবস্থায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের যে রূপান্তর ঘটে তাকেই বলা হয় বিটুমিনাস কয়লা। অবশ্য উদ্বায়ী অংশের পরিমাণ অনুযায়ী এবং অঙ্গারক ও উদজানের অনুপাত বিবেচনা করে এই বিটুমিনাস কয়লার মধ্যেও আবার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এ কয়লার জলীয় ভাগ ও অম্লজান অনেক কম, অঙ্গারকের ভাগও অপেক্ষাকৃত বেশি। প্রজ্বলিত অবস্থায় এর শিখা বেশ ভালো হয় আর ধোঁয়াও বের হয়। বয়লারে বাষ্পের জন্য এবং গ্যাস তৈরির কাজে এ কয়লার বহুল ব্যবহার হয়। বিটুমিনাস কয়লার শ্রেণীবিশেষ থেকেই কোক তৈরি করা যেতে পারে, তাই কৌলিন্যের খাতিরে ক্ষত্রিয়রাজের মতই এর সমাদর।

আমাদের দেশের অধিকাংশ কয়লা এই বিটুমিনাস শ্রেণীভুক্ত।

তার মধ্যে ঝরিয়া গিরিডি ও আসাম অঞ্চল, হাজারিবাগ মধ্যপ্রদেশ এবং রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কতকাংশ এই কৌলিন্যের দাবি করতে পারে।

এই ধরনের কোকিং কয়লাকে বাতাসের আওতা হতে দূরে রেখে আবদ্ধ অবস্থায় প্রায় হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি উত্তাপ দিলে কয়লার অধিকাংশ উদ্বায়ী অংশ অপসারিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ঝামার মত জমাট বাঁধে। এই উত্তপ্ত ঝামাকে জলধারায় ঠাণ্ডা করা হয়। এইভাবে তৈরি কয়লার ঝামাকে কঠিন কোক (hard coke) বলা হয়। সাধারণত ধাতুনিষ্কাশন এবং ঘটিত গ্যাস তৈরির কাজেই ওগুলির ব্যবহার হয়। কয়েকটি বিশেষ অশুদ্ধি, যেমন বেশি ছাই-এর জন্য ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের কিছু কয়লার এবং বেশি গন্ধকের জন্য আসাম অঞ্চলের অধিকাংশ কয়লার কঠিন কোক লৌহনিষ্কাশনের কাজে আসে না।

এইভাবে প্রায় ছয় শত সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি উত্তাপে পোড়ালেও একপ্রকার কোক তৈরি হয়, তবে তার মধ্যে উদ্বায়ী অংশের পরিমাণ কিছু বেশি থেকে যায় এবং তার কাঠিন্যও অনেক কম হয়। এই কোককে 'soft coke' বা নরম কোক বলে। বাড়ির রান্নার কাজে আমরা নিয়ত এই ধরনের কোক ব্যবহার করে থাকি। অপব্যয়ের গুরুত্ব না বুঝে বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোলা বাতাসে স্তূপীকৃত কয়লায় আগুন ধরিয়ে এই কোক তৈরি করা হয়।

রাণীগঞ্জ, বোকারো-করনপুরা, তালচির, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে যেসমস্ত কয়লার খনি আছে বিটুমিনাস্ শ্রেণী-ভুক্ত হলেও তার অধিকাংশই কঠিন কোক তৈরির উপযুক্ত নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামান্য কোক তৈরি হলেও তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তাই এদেরকে নন-কোকিং কয়লা বলেই অভিহিত করা হয়।

বর্ণশ্রেষ্ঠ অ্যান্থ্রাসাইট কয়লা উদ্ভিদ-রূপান্তরের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ

পরিণতি। এই বস্তু খুব কঠিন আর মসৃণ। উদ্বায়ী অংশের পরিমাণও এতে কম। অঙ্গারকের ভাগও সব চেয়ে বেশি। প্রজ্বলিত অবস্থায় কোকের মত ধোঁয়া বা শিখা বিশেষ থাকে না, কিন্তু তাপ খুব বেশি পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এ কয়লা পাওয়া যায় না।

এই বিভিন্ন বর্ণের কয়লার মধ্যে জলীয় ভাগ ও ছাই বাদে বাকি অংশে অঙ্গারক উদজান অম্লজান সোরাজান এবং গন্ধক শতকরা কতখানি থাকে তার একটি মোটামুটি হিসাব দেওয়া যেতে পারে। এই তালিকায় কয়লার পূর্বতন পুরুষ কাঠকেও অন্তর্ভুক্ত করা হল—

	কাঠ	পীট	লিগনাইট	বিটুমিনাস	অ্যানথ্রাসাইট
অঙ্গারক	৫০·০	৬০·০	৬৭·০-৭৪·০	৭৭·০-৮৭·০	৯২·০-৯৪·০
উদজান	৬·০	৬·০	৫·০- ৫·৫	৫·০-৫·৫	৩·০- ৪·০
অম্লজান	৪৩·৫	৩২·০	১৯·০-২৬·০	৪·৭-১৬·০	২·০
সোরাজান ও গন্ধক	০·৫	২·০	১·৫- ২·০	২·০	১·০-২·০

ভারতের অন্যান্য স্থানের কয়লার বয়সের তুলনায় আসামের এবং হিমালয়ের পাদদেশে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে কয়লা পাওয়া যায় তার বয়স অনেক কম। তবে অত্যধিক ভাবনা-চিন্তায় যুবকও যেমন মাঝেমাঝে অকালে বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত হয়, তেমনি ভূপৃষ্ঠের স্থানীয় চাপের আধিক্যে আসামের কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণীভুক্ত এবং কাশ্মীর জম্মু প্রদেশের সামান্য কয়লা অনেকটা অ্যান্থ্রাসাইটের সমকক্ষ হয়েছে বলে ভূতাত্ত্বিকগণের বিশ্বাস। লাভা বা উষ্ণ গলিত শিলার সংস্পর্শে কয়লার স্তরবিশেষ যে ঝামায় পরিণত হয়, তার প্রমাণও স্থানে স্থানে পাওয়া গেছে।

বর্তমানে ঝরিয়া অঞ্চল থেকেই ভারতের চাহিদার প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ কয়লা পাওয়া যায়। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়া অঞ্চল একযোগে সমগ্র ভারতের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কয়লা সরবাহ করে। অদূর ভবিষ্যতে বোকারো-করনপুরা অঞ্চল থেকেও প্রভূতপরিমাণ কয়লা সরবরাহ হবে।

এক টুকরা বিটুমিনাস কয়লা (যা আমরা বাড়ির চুলায় সচরাচর ব্যবহার করে থাকি) নিয়ে ভালোভাবে পরীক্ষা করলে খালি চোখেই দেখা যায় যে, তার কতকগুলি স্তর উজ্জ্বল ও মসৃণ, আর বাকি স্তরগুলি অনুজ্জ্বল ও অমসৃণ। আমাদের দেশের কয়লায় উজ্জ্বল অংশের পরিমাণ সাধারণত শতকরা ৩০-৩৫ ভাগের বেশি নয়। অবশ্য রাণীগঞ্জ অঞ্চলের কয়লায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। অন্য অনেক দেশের কয়লায় এই উজ্জ্বল অংশের পরিমাণ শতকরা ৬৫-৭০ ভাগেরও বেশি হয়ে থাকে। কয়লার উৎপত্তিকালের প্রাকৃতিক অবস্থাই এর জন্য মূলত দায়ী।

এই স্তরবৈষম্য বিটুমিনাস্ কয়লার একটি বিশেষ গুণ। অ্যানথ্রাসাইট বা লিগ্‌নাইটে এই বৈষম্য বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় না।

কয়লার উপাদান

কয়লার উপাদান বলতে মৌলিক উপাদানই আমাদের আলোচ্য। তবে ব্যাবহারিক দিক থেকে যেসব অদাহ্য অংশ, যেমন ছাই এবং জলীয় অংশ, কয়লার তাপশক্তির তারতম্য ঘটায়, সে বিষয়েও উল্লেখ করা দরকার। সাধারণ ভাবে বলা চলে যে শেষোক্ত দুইটির অনুপাতেই বর্তমানে এদেশে কয়লার মূল্য নিরূপিত হয়।

কয়লার মধ্যে অঙ্গারকের প্রাধান্য থাকলেও কয়লা যে শুধু অঙ্গারক (কার্বন) নয়, এ কথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই। উদ্ভিদের এই পরিণতির মধ্যে উদ্ভিদদেহের সমস্ত মূল উপাদানগুলি যে বর্তমান থাকে তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়াও সৃষ্টিকালে যেসব আবেষ্টনীর মধ্যে দিয়ে পার হয়েছে, তার প্রভাবও এর সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট থাকে।

উদ্ভিদদেহস্থিত কার্বোহাইড্রেটের উপাদান হল অঙ্গারক উদজান এবং

অম্লজান। সেইসঙ্গে সোরা প্রভৃতি কয়েক জাতীয় লবণও দ্রবের আকারে উদ্ভিদদেহে বর্তমান থাকে। রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায়ে কার্বোহাইড্রেটের কিছু অঙ্গারক উদজান এবং অম্লজান এদের পারস্পরিক যৌগিক পদার্থ হিসাবে নির্গত হয়। কিন্তু উদজান ও অম্লজানের অনুপাতে অঙ্গারক দূরীভূত হয় কম। ফলে, পরিণতির প্রায় প্রত্যেক ধাপে উদজান-ও অম্লজান-হীনতা এবং অঙ্গারক-বহুলতা ঘটে। এই অবস্থায় জল ও ভূত্বকের সংশ্লিষ্ট নানাপ্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থের সঙ্গে এর উপাদান বিনিময় ঘটে। রূপান্তরিত উদ্ভিদের মধ্যস্থিত লবণ কিয়দংশ জলে দ্রবীভূত হয় এবং সেইসঙ্গে জল-মধ্যস্থিত ক্যাল্‌শিয়াম এবং লৌহজাতীয় লবণ এবং অনুরূপ খনিজ পদার্থ এই উদ্ভিদের মধ্যে সঞ্চিত হয়। কাদামাটি এবং বালিও এর মধ্যে এসে জমা হয়। স্থান কাল ও জলের অবস্থা বিশেষে এই খনিজ পদার্থগুলি সূক্ষ্ম অথবা স্থূল স্তরে অথবা অঙ্গাঙ্গিভাবে এই উদ্ভিজ্জ পদার্থের মধ্যে স্থান করে নেয়। পরবর্তীকালে কয়লার গুণাগুণ এই মিশ্রণের প্রভাবের উপরেই নির্ভর করে।

যেসমস্ত ব্যাক্‌টিরিয়া উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রথম রূপান্তর ঘটায় অথবা যেসমস্ত জীবদেহ এর সঙ্গেই সমাধি লাভ করে, তাদের দেহের কিছু উপাদানও এই কয়লার মধ্যে থেকে যায়। জৈব সোরাজান এবং জৈব গন্ধক এই কারণেই কয়লার মধ্যে পাওয়া যায়। স্থানবিশেষে গলিত আগ্নেয় শিলার সঙ্গেও এই উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংযোগ ঘটে।

কয়লার উপাদানগুলিকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। জৈব অঙ্গারক উদজান অম্লজান সোরাজান ও গন্ধক এবং অজৈব অংশ হিসাবে নানাজাতীয় খনিজ পদার্থ। কম-বেশি পরিমাণে জলও সব কয়লার সঙ্গে থাকে। অতএব জলকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে।

কয়লা যদি কেবলমাত্র প্রথমশ্রেণীর জৈব পদার্থগুলির যৌগিক পদার্থ হত, তা হলে কয়লা পোড়ালে কোনো ছাই পাওয়া যেত না, উপরন্তু প্রাপ্ত

তাপশক্তির পরিমাণ বেশিই হত। কিন্তু গোলাপ ফুলের সঙ্গে তার কাঁটা-গুলিকে যেমন আমরা অস্বীকার করতে পারি নে, তেমনি অজৈব পদার্থ সংযুক্ত অবিশুদ্ধ কয়লাকেই প্রকৃতির দান হিসাবে আমাদের আদরে গ্রহণ করতে হয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য অতিমাত্রায় অবিশুদ্ধ কয়লার আংশিক বিশুদ্ধিকরণের চেষ্টা অনেকখানি সাফল্য-লাভ করছে। স্থানবিশেষে এ আলোচনা করা যাবে।

জৈব উপাদানগুলি বিশুদ্ধ কয়লার (pure coal) মূল কারণ হলেও তার মধ্যে কেবলমাত্র অঙ্গারক এবং উদজান হতেই প্রধানত কয়লার সমস্ত তাপশক্তি পাওয়া যায়। তাই কোনো কয়লার পরিণতি বিচারের সময় অঙ্গারক এবং উদজান এই দুইএর অনুপাতকেই বিচার করা হয়। তবে জৈব গন্ধকও কিয়ৎপরিমাণে তাপশক্তি দান করে, কিন্তু অঙ্গার ও উদজানের তুলনায় এই দান নগণ্য। সোরাজান থেকে কোনো তাপশক্তি পাওয়া যায় না। অম্লজানের উপস্থিতি তাপহ্রাসের কারণ হয়। তাই অঙ্গারক ও উদজানের অনুপাত নির্দিষ্ট থাকলে অম্লজানের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কয়লায় অম্লজানের পরিমাণ দিয়েও পরিণতির মাপ করার প্রথা আছে।

ঘুটিং পুড়িয়ে চুন তৈরি অনেক সময়ই চোখে পড়ে। ঘুটিং অজৈব পদার্থ, কয়লার মত জৈব পদার্থ তার মধ্যে নেই, তবু নির্দিষ্ট ওজনের ঘুটিং পোড়ালে তার ওজন অনেক কমে যায় এবং দগ্ধ বস্তুর আকারও অন্যরূপ হয়। কয়লা পোড়ালে তার মধ্যস্থিত অজৈব পদার্থগুলির ভাগ্যেও এই একই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ কয়লা পুড়িয়ে যে পরিমাণ ছাই আমরা পাই, কয়লার মধ্যে অজৈব পদার্থের পরিমাণ তার চেয়েও বেশি থাকে। কতখানি বেশি তা নির্ভর করে বিভিন্ন শ্রেণীর অজৈব পদার্থের উপর। তবে গড়পড়তা এই শ্রেণীর ১০০ ভাগ অজৈব পদার্থ থেকে ৯০ ভাগ ছাই পাওয়া যায়। উদ্ভিদদেহে এই অজৈব পদার্থের পরিমাণ কম

থাকে। তাই কাঠ বা কাঠকয়লা পোড়ালে ছাই খুব কম পাওয়া যায়। কয়লা অপেক্ষা কাঠের অম্লজান অনেক বেশি এবং অঙ্গারক অপেক্ষাকৃত কম বলে কয়লার অনুরূপ তাপশক্তি কাঠে পাওয়া সম্ভব নয়।

কয়লার ছাই সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে আলোচনা আবশ্যক। যে তাপশক্তি-দানের ক্ষমতার উপর কয়লার মূল্য নিরূপিত হয় তার কিছুই তো এই জৈব অংশ থেকে পাওয়া যায় না, উপরন্তু এগুলি পুড়ে ছাই হবার সময় কিছু পরিমাণ তাপশক্তি নষ্ট করে। সাধারণ ভাবে দহনের পর কিছু কয়লার কণা অদগ্ধ অবস্থায় থাকে, এর দ্বারাও প্রাপ্ত তাপশক্তির পরিমাণ কম হয়। এইজন্য বাড়ির উনুনে পুড়িয়ে কয়লার যে ছাই পাই, তাকে ধুয়ে শুকিয়ে পুনরায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্ষার অথবা লৌহ জাতীয় পদার্থের আধিক্য ঘটলে বয়লারে ব্যবহৃত কয়লার ছাই গলিত অবস্থায় দহনোপযোগী বাতাসের গতি রুদ্ধ করে এবং ঐ দরুন নানা প্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোকিং কয়লার মধ্যেও নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত ছাই বর্তমান থাকলে তা বেশি ধাতুমল (slag) সৃষ্টি করে, তাই বিশেষ ভাবে লৌহ ধাতু নিষ্কাশনে অব্যবহার্য হয়।

অতিমাত্রায় অজৈব কিংবা জৈব গন্ধকও বাঞ্ছনীয় নয়। দহনের পর গন্ধক শুধু যে বায়ুমণ্ডলকেই দূষিত করে তা নয়, বয়লার প্রভৃতিকেও তাড়াতাড়ি নষ্ট করে। কোকের মধ্যে বেশি গন্ধকও এইরূপ নানাকারণে কাম্য নয়। লৌহ-শিল্পে নিয়োজিত কোকের সঙ্গে গন্ধক কিংবা বেশি ফস্‌ফোরাস থাকলে উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া দুষ্কর হয়।

এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, ১০০ টন কয়লা পুড়িয়ে যদি ৩০ টন ছাই পাওয়া যায়, তা হলে আমাদের পূর্ব হিসাব অনুযায়ী এই ১০০ টন কয়লার অজৈব পদার্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩⅓ টন এবং তার মধ্যে বিশুদ্ধ

কয়লা থাকে ৬৬⅔ টন। এখন ১০০ টন কয়লা ক্রয় করলে তার অন্তর্ভুক্ত এই ৩৩⅓ টন অদাহ্য বস্তুর মূল্য দিয়েই আমরা ক্ষান্ত হই না, এই পরিমাণ অদাহ্য বস্তুর রেলপথে অথবা অন্যান্য যানবাহনে স্থানান্তর করার খরচও দিয়ে থাকি ; অথচ উল্লিখিত অসুবিধাগুলিও থাকে। তা ছাড়া ছাই অপসারণেরও একটা খরচ আছে। এইসমস্ত বিবেচনা ক'রে অন্তর্ভুক্ত ছাইয়ের পরিমাণের উপরই কয়লার মূল্য নির্ধারিত হয়।

বর্তমানে কোনো কোনো স্থলে কয়লার ছাই থেকে প্লাটিনাম (platinum), জারমেনিয়াম (germanium) প্রভৃতি মূল্যবান এবং দুর্লভ ধাতু সংগ্রহের চেষ্টা চলেছে।

যেহেতু ভারতীয় কয়লার জন্ম নানারূপ বিপর্যয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে এবং অনুবাহেই এর উৎপত্তি সেজন্য অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় এ দেশের কয়লার ছাই বেশি পাওয়া যায়। এই হিসাবে দক্ষিণ-আফ্রিকা দক্ষিণ-আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার কয়লা ভারতের সমতুল্য। অধিক ক্ষেত্রে ছাই বা অজৈব পদার্থ কয়লার সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে যে, কয়লা থেকে সেগুলি পৃথক করে আংশিক বিশুদ্ধীকরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য। তবে আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমাদের দেশে যে বিস্তৃত লৌহপ্রস্তর রয়েছে তার অধিকাংশ খুবই উচ্চশ্রেণীর। তাই এদেশে লৌহ-নিষ্কাশনে বেশি ছাই সংযুক্ত কোকিং কয়লার ব্যবহার চলেছে।

ঝরিয়া গিরিডি এবং বোকারো প্রভৃতি অঞ্চলে যে কয়লা পাওয়া যায়, তার ছাইএর পরিমাণ সাধারণত শতকরা ১০ ভাগ হতে ৩৫-৪০ ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। রাণীগঞ্জ মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের নন্-কোকিং কয়লার ছাইএর পরিমাণ প্রায় এর অর্ধেক। আসামের কয়লায় শতকরা ৫ ভাগের নীচেও ছাই থাকে। লৌহ-নিষ্কাশনের জন্য যে কোকিং কয়লার ব্যবহার হয়, তার ছাই ১৫ শতাংশের অনূর্ধ্ব হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ছাইএর পরিমাণ ১৭ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

কয়লার মধ্যে যে অল্পবিস্তর জল থাকে, এবার তার কথা ধরা যাক। কয়লার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জল অবস্থান করে সত্য, কিন্তু দহনের পর তার নিরপেক্ষতা ভঙ্গ হয়। দহনক্রিয়ার ফলে বাষ্পে রূপান্তরিত হবার সময় এই জল কয়লার তাপশক্তি কিছুটা অপহরণ করে এবং অকার্যকরী অবস্থায় এই বাষ্প বাতাসে মিশে যায়। তাই কয়লার মধ্যে জলের পরিমাণ লভ্য তাপশক্তির পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করে। এমত অবস্থায় যদি ১০০ টন কয়লার মধ্যে ১০ টন জল থাকে, তা হলে এই ১০ টন জলের মূল্য এবং তদনুযায়ী বিনষ্ট তাপশক্তি প্রণামীস্বরূপ ক্রেতাকে দিতে হয়। সেইজন্য কয়লায় জলের পরিমাণ বেশি হলে মূল্যনির্ধারণের সময় সে কথা বিবেচনা করা হয়। আধুনিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে উন্নত দহনক্রিয়ার জন্য সামান্য পরিমাণ জলেরও প্রয়োজন আছে।

সাধারণ ভাবে ভারতবর্ষের কোক প্রস্তুতের উপযোগী বিটুমিনাস কয়লার মধ্যে জলের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগের উপরে যায় না। কিন্তু কোক তৈরির অনুপযুক্ত বিটুমিনাস কয়লায় এই জলের পরিমাণ শতকরা ১০-১৫ ভাগও হতে পারে।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু কয়লার সঙ্গে জলের উপস্থিতির একটা সুবিধা আছে। সযত্নে রক্ষিত স্তূপীকৃত কয়লায় আপনা হতেই আগুন লাগা একটি সাধারণ ঘটনা। যদিও এই স্বতঃস্ফূর্ত দহনের (spontaneous combustion) জন্য কয়লার সরন্ধ্রতা (porosity) এবং স্থানীয় তাপ অনেকাংশে দায়ী, তবু উপযুক্ত পরিমাণ জলের উপস্থিতি এই আশঙ্কা দূরী-করণে সমর্থ হয়। কয়লার সরন্ধ্রতা বেশি হলে স্বাভাবিক জলের পরিমাণও বেশি হয়। কিন্তু আংশিক শুষ্ক অবস্থায় এইসব কয়লায় আগুন লাগার সম্ভাবনাও বাড়ে। তা ছাড়া উন্মুক্ত স্থানে বেশিদিন জমা থাকলে কয়লার তাপশক্তি কিছু পরিমাণে ক্ষয়িত হয়। এই ক্ষয় (weathering) নিবা-রণের জন্যও জলের প্রয়োজনীয়তা আছে। কোনো কোনো দেশে তাই জলের বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যেই উৎখাত কয়লা সংরক্ষিত করা হয়।

কয়লার খনি

প্রথম পাতালপুরী-প্রবেশে ভীমের দুর্দশা হয়েছিল সত্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিজের দুর্জয় শক্তি দ্বারা সেখানে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন এবং সেখানকার আতিথ্য গ্রহণেও সুখী হয়েছিলেন। মানুষের প্রথম খনিগর্ভ-প্রবেশের ইতিহাস এরূপ দুর্যোগপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য হলেও নব্যবিজ্ঞান তার হাতে যে ভীমের শক্তি দিয়েছে, তার দ্বারা সে শুধু সমস্ত প্রতিকূলতাকে পরাভূত করেই ক্ষান্ত হয় নি, প্রকৃতির গুপ্তধনের শেষ কণাটি পর্যন্ত নিয়ে এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যগঠনে প্রয়াসী হয়েছে।

এমন একদিন ছিল যখন কয়লাখনিতে কাজ করার জন্য লোক পাওয়া দুঃসাধ্য হত। খনির ভয়াবহ অন্ধকার, দেহের উপর কতিপয় রুদ্ধ গ্যাসের বিষক্রিয়া, অগ্নিস্পর্শে দাহ্য গ্যাসের বিস্ফোরণ, নিয়ত জলপ্রবাহ এবং অকস্মাৎ ছাদ ধসে পড়া প্রভৃতির জন্য আসন্ন মৃত্যুর মুখে এই বিমুখতা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু উন্নতধরনের খননপ্রণালী এবং সতর্কতামূলক নানারূপ ব্যবস্থা ও নিয়মাবলীর জন্য এই অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। তবু এই পাতালপুরীর কঠোর কাজে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও যেসব শ্রমিক এবং বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত থাকেন, তাঁদের মজুরি এবং সুখসুবিধা অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান অপেক্ষা কিছু বেশি হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুখের বিষয় এইদিকে আমাদের রাষ্ট্রের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি আছে।

যাই হোক, কয়লাস্তরের (coal seams) অবস্থান এবং গঠন অনুযায়ী বিভিন্নপ্রকার খননপ্রণালী দ্বারা খনি হতে কয়লা তোলা হয়। এক্ষণে এই কয়লাস্তরের অবস্থান এবং গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক।

মহাকালের পদচিহ্ন আঁকা কয়লাস্তরের জন্মকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই স্তরগুলি বইএর পাতার মত পর পর বিন্যস্ত থাকে না অথবা পরিণতিকালে উদ্ভিজ্জ-পদার্থগুলি সমতল ভূমিতেও অবস্থান করে

না। ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের সঙ্গে স্তরগুলির অবস্থানও পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনকালে স্তরের বিভিন্ন অংশের ফাটল ও চ্যুতি (faults) ঘটেছে। একটা কয়লাস্তর হতে আর-একটা স্তরের দূরত্ব সামান্য কয়েক ফুট থেকে কয়েক শত ফুট পর্যন্ত হয়েছে। কখনও কখনও দু-তিনটি স্তরকে সম্মিলিত ভাবেও থাকতে দেখা যায়। দুইটি স্তরের মধ্যবর্তী অংশে নানাবিধ পাললিক স্তর থাকে।

মেঝের উপর একটি কালো শতরঞ্জি বিছিয়ে, তার উপর ক্রমান্বয়ে একটি ধূসর রঙের গালিচা, একটি তোষক, একটি নীল বিছানার চাদর এবং সর্বোপরি একটি ভেলভেটের ঢাকনা দিলে যেমনটি দেখায়, ধরিত্রীর গর্ভে অন্যান্য স্তরের সঙ্গে কয়লার স্তর বা বেড অনেকটা সেইভাবে থাকে। কয়লাস্তরের অবস্থান এই কালো শতরঞ্জির বিস্তৃতির অনুরূপ হলেও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মাঝে কিছুকিছু ব্যতিক্রম ঘটতে পারে— এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মেঝে যদি সমতল থাকে তা হলে স্তরগুলি সমতল হয় সত্য, কিন্তু নত অবস্থায় নত এবং আন্দোলিত অবস্থায় আন্দোলিত থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিছানার ক্ষেত্রে কালো শতরঞ্জি মাত্র ¼ ইঞ্চি, কিন্তু কয়লার স্তর তার জায়গায় ১ ইঞ্চি থেকে ১২০-১৩০ ফুট পর্যন্ত মোটা হতে দেখা গেছে। আর তাদের বিস্তৃতিও তেমনি দৈর্ঘে ২৫-৩০ মাইল এবং প্রস্থে ১৪-১৫ মাইল পর্যন্ত পাওয়া যায়। চ্যুতির জন্য স্তরের নিরবচ্ছিন্নতা যদিও কোনো কোনো স্থলে রক্ষিত হয় না, তবু অতীতে তার বিভিন্ন অংশগুলি যে একই ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

দুই হাজার ফুট গভীরতার নীচেও কয়লাস্তরের অস্তিত্ব আছে সত্য, কিন্তু বিশেষ দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণত আমাদের দেশে এক হাজার ফুটের নীচের কয়লাতোলার চেষ্টা করা হয় না। একই স্তরের বেধ সর্বত্র সমান থাকে না। স্তর খুব পাতলা হলে কয়লাখনন করা দুঃসাধ্য হয়, অথবা শ্রমের অপব্যয় ঘটে। তবে বর্তমানে কয়লা খনন ও বহনকারী যন্ত্রের

সাহায্যে ৩-৪ ফুট মোটা স্তরের কয়লা কাটা হচ্ছে। এ কথা ভাবা সহজ যে, যে স্তরে মানুষের দাঁড়াবার মত অন্তত ৬ ফুট জায়গা না থাকে সেখানে কয়লা কাটা কঠিন হয়, আবার ৮-১০ ফুটের বেশি হলেও মানুষের নাগালের বাইরে যাওয়ার দরুন নানারূপ অসুবিধা হয়। ৩-৪ ফুট মোটা স্তরে যাতায়াতের সময় ছালা (pad) বেঁধে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়, কিংবা চলাফেরার জন্য কয়লার নীচের অথবা উপরের পাথর কেটে মানুষের যাতায়াতের রাস্তা বানাতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের কয়লাস্তরগুলির বেধ সাধারণত এত কম নয়। বোকারো-করনপুরা অঞ্চলে ১০০ ফুটেরও বেশি মোটা স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সেখানে কাজও চলছে।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হেতু কয়লার স্তর অনেক সময় মাটির অল্প নীচেই পাওয়া যায় অথবা হয়তো খোলাখুলিই থাকে। এমন অবস্থায় পুকুর খোঁড়ার মত কয়লা খুঁড়ে বের করা হয়। কিংবা উপরে মাটি বা পাথরের যে সামান্য আবরণ থাকে তা সরিয়ে ফেলে কয়লা কাটা হয়। এরই নাম ওপন্ কাস্ট মাইনিং (open cast mining)। এইভাবে কোয়েরি (quarry) বা পুকুরখাদ কাটা হয়।

উপরের মাটি বা পাথরের আবরণ (over burden) কিছু বেশি হলে শুধু কায়িক পরিশ্রম দ্বারা কয়লা তোলা ব্যয়সংগত হয় না। অন্যপ্রকার খনন ও উত্তোলন-প্রণালীর আশ্রয় নিতে হয়। যান্ত্রিক শক্তির বহুল প্রয়োগ দ্বারা এবং কালে কালে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক পন্থা ও অপচয়রোধের ব্যবস্থা দ্বারা এই ধরনের খননপ্রণালী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। অনেকক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণীর বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারাই কয়লার এবং পাথরের সুকঠিন স্তর ভাঙা হয়।

কোনো কয়লার স্তর ৫০ হতে ১০০ ফুট গভীরতার মধ্যে পাওয়া গেলে এই স্তরে উপর থেকে ঢালু সুড়ঙ্গ (incline) চালানো হয়। অনেক সময় পাহাড়ের তলদেশেও এইরূপ স্তরের প্রান্তদেশ দেখা যায়। এ

অনেকটা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামার মত। পাহাড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা যার আছে সে জানে পাহাড়ের খাড়াই বেশি হলে ওঠানামার কি অসুবিধা। এক্ষেত্রেও উৎরাই বা ঢালুতার উপরেই এই নত সুড়ঙ্গখাদের সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করে। পুকুরখাদের কয়লাস্তরের সবটুকু আহরণ করা সম্ভব হয়, কিন্তু সুড়ঙ্গখাদ খননে তা হয় না। সাধারণত ⅓ অংশ বা কিছু বেশি কয়লা প্রথম দফায় পাওয়া যায়। অধুনা বালু-ভরাট (sand stowing) দ্বারা এই প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণ শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রথম দফায় কম কয়লা পাওয়ার প্রধান কারণ উপরের মাটি বা পাথরের যে ওজন আছে তা কয়লাস্তরের মাথায় অহরহ চাপ দিয়ে এবং এই ভার ধরে রাখার জন্য খনির ভিতর কয়লার স্তম্ভ (pillar) রাখা একান্ত প্রয়োজন। এই স্তম্ভ রাখতে হলে প্রধান সুড়ঙ্গপথগুলির সমান্তরাল ও আড়াআড়ি আরও অনেক সুড়ঙ্গ (gallery) চালানো হয় এবং সুড়ঙ্গ-পরিবেষ্টিত অখাত কয়লার স্তম্ভ তৈরি হয়। বাড়ির ভিত কাটার সময় দাবার ছকের অনুরূপ যেভাবে মাটি কাটা হয়, এও প্রায় সেই রকমের। কয়লার উপরের মাটি যদি সরানো সম্ভবপর হত, তা হলে উপর থেকে সুড়ঙ্গখাদের চিত্র এইরূপ চতুষ্কোণ নালীপথ ও তাদের মধ্যস্থিত নিরেট কয়লাস্তম্ভের আকারেই দেখা যেত।

তলদেশ-সন্নিকটস্থ কয়লা অপসারণের পর কয়লাস্তর কিছুটা গভীর হলেই সমস্ত সুড়ঙ্গপথ লোক কয়লা বা মাল চলাচলের জন্য সবসময় ব্যবহৃত হয় না। এর জন্য দু-চারটি সুড়ঙ্গপথ নির্দিষ্ট থাকে। মাঝেমাঝে এইসব সুড়ঙ্গের ছাদ পরীক্ষা করে ভালো অবস্থায় রাখার প্রতি যত্ন নেওয়া হয়। অন্য সুড়ঙ্গগুলির মুখে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়। তবে অকস্মাৎ আপদবিপদের জন্য কমপক্ষে দুটি রাস্তা খোলা রাখা একান্ত প্রয়োজন। যদি কেবলমাত্র একটি রাস্তাই থাকে এবং দুর্বিপাকবশত ছাদের কয়লা বা পাথর ধ'সে সেটি বন্ধ হয়, তবে ভিতরের লোকদের নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হয়।

আগেই আমরা জেনেছি যে, কয়লার সুড়ঙ্গের উচ্চতা ৮-১০ ফুটের বেশি হওয়া কাম্য নয়। তাই কয়লাস্তর বেশি উচ্চ হলে তাকে কয়েকটি তলে ভাগ করে কাজ করা হয়। এমত অবস্থায় কয়লাস্তরের অভ্যন্তরস্থ পাথরের স্তরগুলির উপর লক্ষ্য রেখেই এই ভাগ করা হয়। মোটা এবং শক্ত পাথরের স্তর যেখানে থাকে না সেখানে নির্দিষ্ট বেধের কয়লাকেই ছাদ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রত্যেক তলের ছাদ পরীক্ষা করে কোনোরূপ বিপদ-আশঙ্কা দেখা গেলেই কাঠের খুঁটি অথবা লোহার বীম্ দ্বারা কয়লার ছাদ ও নরম দেওয়ালকে ঠেকানো হয়। অবস্থাবিশেষে এইসব খুঁটি ও বীমের সমাবেশের জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলন করতে হয়।

স্তম্ভে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রথম দফায় অত্যন্ত বেশি থাকে। এই কয়লা যখন নেবার প্রয়োজন হয় তখন স্তম্ভগুলিকে আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হয়। স্তম্ভের বদলে কাঠের খুঁটি বা প্রপ্ (prop) দ্বারা উপরের চাপ রক্ষা করা হয়। এই কাজ খুবই বিপজ্জনক। তবে আজকাল বালু-ভরাট (sand stowing) দ্বারা এই স্তম্ভ অপসারণ অনেক সহজসাধ্য হয়েছে এবং নানারূপ দুর্ঘটনার হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া গেছে।

বালু-ভরাটের জন্য নিকটবর্তী নদী থেকে বালু আনা হয়। বালু-বহনের কাজে শূন্যে ঝুলন্ত রজ্জুপথ (œrial rope-way) বিশেষ কার্যকরী। এই বালু জল-মিশ্রিত অবস্থায় নলদ্বারা খনিগর্ভে নীত হয়। উদ্বৃত্ত জল পাম্পের সাহায্যে পরে উপরে তুলে নেওয়া হয় এবং এই ভরাট বালি কয়লাশূন্য স্থান অধিকার করে। বালু-ভরাটের জন্য উপরিস্থিত পাথর বা মাটি ধসে পড়ার সুযোগ পায় না এবং ভূমিপৃষ্ঠে অবস্থিত রাজপথ ঘরবাড়ি ইত্যাদির কোনো ক্ষতিও হয় না। বালু যেখানে দুষ্প্রাপ্য সেখানে বয়লারের ছাই এবং পাথরমাটি দিয়েও ভরাটের কাজ করা হয়। এ কাজের জন্য আমাদের

জাতীয় সরকার খুবই উৎসাহ দিচ্ছেন এবং স্টোয়িং বোর্ড গঠন ও স্টোয়িং কর ধার্য করে কয়লাশিল্পের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্বত্বাধিকারী থাকার দরুন নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নত সুড়ঙ্গ প্রথায় খাদ করা সম্ভব হয় না। আবার গভীরতা ৫০ হতে ১০০ ফুটের বেশি হলে এই প্রথায় কয়লা আহরণ ব্যয়সঙ্গত নয়। এইসব ক্ষেত্রে স্তর হতে কয়লা পাবার জন্য আর-একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়। কূপখননের অনুরূপ ১৪ ফুট হতে ২২ ফুট ব্যাসের অন্তত পক্ষে দুটি বৃত্তাকার গর্ত খোঁড়া হয়। এই দুটি কূপের দূরত্ব কমপক্ষে ৪৫ ফুটের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই কূপকে বলে মাইন্ শাফ্ট (mine shaft) বা পিট্ (pit)। প্রথমে মাটির স্তর বা নরম পাথরের স্তর কাটা হয় এবং চারি পাশের মাটি যাতে গর্তে ধসে না পড়ে তার জন্য সিমেণ্টের গাঁথুনি দিয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। তার পর ডাইনামাইটের দ্বারা শক্ত পাথরের স্তর ভেদ করতে করতে যে পর্যন্ত না আকাঙ্ক্ষিত কয়লাস্তরে পৌছনো যায় সে পর্যন্ত শাফ্টটি খনন করা হয়। কয়লাস্তরে পৌছে শাফ্টের চারিটি বিভিন্ন দিকে সুড়ঙ্গপথ চালানো হয়। কয়লা কেটে বাইরে আনার সঙ্গেই ঐসমস্ত সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। কয়লাস্তর ও খনির অবস্থা বিবেচনা করে সুড়ঙ্গ ও স্তম্ভের খসড়া করে নেওয়া হয়। এর জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এর পর যাবতীয় কাজ জরিপের সাহায্যে যথানিয়মে চালানো হয়। কোনো কোনো খনিতে অধিক সুবিধা-লাভের আশায় দুয়ের অধিক শাফ্ট খোঁড়া হয়। আধুনিক কলকব্জা ও সাজসরঞ্জাম ভূষিত শাফ্টের সাহায্যে বর্তমান যুগে তিন হাজার ফুট গভীর কয়লাস্তর হতেও কয়লা তোলা সম্ভব হচ্ছে।

গ্রাম্য অঞ্চলে কুয়ো খোঁড়ার সময় দড়ি বালতি এবং কপিকলের সাহায্যে কুয়ো হতে যেমনভাবে মাটি পাথর ও জল তোলা হয়, শাফ্ট

বা পিটের মুখে কয়লা তোলা ও মানুষ ওঠানামার জন্য অনুরূপ কলকব্জার সাহায্য নেওয়া হয়। ইস্পাতের তারের তৈরি সুদৃঢ় দড়ির সাহায্যে লোহার ডুলি বা পালকির আকারের বাক্স ওঠানামা করে। ৮ হতে ১৬ ফুট ব্যাসের দুটি প্রকাণ্ড লোহার চাকা একটি ২৫-৩০ ফুট অথবা আরও উচ্চ লৌহমঞ্চে স্থাপন করে এই ডুলি ওঠানামার ব্যবস্থা করা হয়। ডুলি চালাবার জন্য একটি বহু-অশ্বশক্তি-বিশিষ্ট ইঞ্জিন নিযুক্ত রাখা হয়। এই ইঞ্জিনের শক্তি সরবরাহ করে সেই খনিরই কয়লা— কখনও-বা বাষ্প-শক্তির আকারে, কখনও-বা সেই শক্তির মূর্তিভেদ বৈদ্যুতিক শক্তিরূপে। স্থান ও ক্ষমতা বিশেষে এইসকল ইঞ্জিন একসঙ্গে তিন টন ওজনের যে-কোনো জিনিসকে শূন্যপথে ওঠাতে পারে। সচরাচর দুটি ডুলি পাশাপাশি একই শাফ্‌টের ভিতর কাজ করে। একটি যখন উপরে ওঠে, অপরটি তখন নীচে নামে। নিরাপত্তামূলক ঘণ্টা ও কঠোর তত্ত্বাবধানের মধ্যেই এই ডুলিগুলি ওঠানামা করে।

পাথর ও কয়লা কাটার জন্য সাধারণ কয়লাকাটা গাঁইতি, ছোট ইস্পাত-ফলক (কুনি বা ছেনি), লোহার বড় বড় হাতুড়ি ও ইস্পাতের শাবল ব্যবহার হয়। এইসব হাতিয়ার চালাবার জন্য সুদক্ষ ও শক্তিমান লোকের প্রয়োজন। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারে এবং মনুষ্যশক্তির (man-power) দুর্মূল্যতায় বিস্ফোরক-দ্রব্যের সাহায্যে কয়লাকে শক্ত স্তর হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত কয়লাকাটার যন্ত্র এই ব্যাপারে যুগান্তর এনেছে। খনি যেখানে সংকীর্ণ সেখানে এই যন্ত্র অপরিহার্য বলতে পারা যায়। কয়লা ও পাথর স্তরের ভিতর বিস্ফোরক-দ্রব্য প্রবিষ্ট করার জন্য ছিদ্রপথ (bore-hole) খোঁড়ার প্রয়োজন হয়। এই কাজে বৈদ্যুতিক ছিদ্রকারী যন্ত্রের (electric drilling machine) ব্যবহার দিন দিন প্রসার-লাভ করছে।

কয়লাকাটার পর সেগুলি উপরে নিয়ে আসাই এক কঠিন কাজ।

কয়লার খণ্ডগুলি বেশ বড় হলে সেগুলি হাতুড়ি দিয়ে ভাঙা হয় এবং বেতের বা বাঁশের ঝুড়িতে ভরা হয়। কাজের জায়গার খুব কাছাকাছি পর্যন্ত রেললাইনের মত ছোট ছোট লাইন পাতা থাকে আর তার উপর মাল-গাড়ির মত চাকা দেওয়া এক প্রকার টবগাড়ি বা ট্রলি থাকে। ঝুড়িভর্তি কয়লাগুলো মাথায় করে এই টবগাড়ির মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়। এইরূপ কয়েকটি টবগাড়ি ভর্তি হলে সেগুলি ঠেলে কিংবা টেনে মূল সুড়ঙ্গপথে আনা হয়। এখানে অনেকগুলি টবগাড়ি একত্রে টানার জন্য যান্ত্রিক শক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। শাফ্‌টের কাছে এনে এই কয়লাভর্তি গাড়িগুলিকে একে একে বা কোনো স্থানে একসঙ্গে দুটিকে ডুলির মধ্যে চড়িয়ে উপরে নিয়ে আসা হয়। নত সুড়ঙ্গগুলিতে অবশ্য কয়লাবোঝাই টবগাড়ি একেবারে উপরে আসে। কয়লা জমা করার নির্দিষ্ট স্থানে সেগুলিকে খালি করে পুনরায় খনিগর্ভে পাঠানো হয়। সরাসরি এই কয়লাকে যান্ত্রিক চালানির মধ্যে এনে নির্দিষ্ট আয়তনের কয়লা পৃথক করে এবং মিশ্রিত পাথরের টুক্‌রা হাত দিয়ে কুড়িয়ে ফেলে দিয়ে মালগাড়ি ভর্তির ব্যবস্থাও কোনো কোনো খনিতে থাকে।

কয়লা কাটার জন্য যেমন আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলন বেড়ে যাচ্ছে তেমনি টবগাড়িতে কয়লা বোঝাই করা ও কয়লা সমেত টবগুলিকে কয়লা কাটার স্থান হতে সুদূর পিটের মুখ পর্যন্ত নিয়ে আসার জন্য বর্তমানে বিদ্যুৎ বা বাষ্প চালিত হলেজ ইঞ্জিন (haulage engine), কন্‌ভেয়ার (conveyor) নামক যন্ত্র (ভ্রাম্যমাণ রবার বা লৌহপাতের ফিতা) এবং বিদ্যুৎ বা ডিজেল চালিত লোকোমোটিভ ইঞ্জিনের (locomotive engine) ব্যবহার চলছে। ড্র্যাগলাইন (dragline), বুল ডোজার (bull dozer), এক্‌স্‌কেভেটার (excavator), কন্‌টিনিউয়াস্‌ কোল্‌ কাটার (continuous coal-cutter), কোল্‌ পিক্‌ (coal pick), মেকানিকাল শভেল (mechanical shovel), স্ক্রেপার (scraper),

জয় লোডার (joy loader) প্রভৃতি অভিনব যন্ত্রপাতির সাহায্যে বা প্রয়োগে কয়লা কাটা ও উত্তোলনের কাজ আশ্চর্যভাবে সহজ হয়ে গিয়েছে।

কয়েকটি বিশেষ খনি ছাড়া আমাদের দেশে উন্নতধরনের খননকার্য চালু হয় নি বা উপরিউক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহার হচ্ছে না। তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল রাখার জন্য অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এ বিষয় মনোযোগী হতেই হবে।

খনিগর্ভে কয়েকটি বিশেষ অসুবিধা ও আশঙ্কার কথা এবং সে বিষয় নিরাপত্তামূলক দু-একটি ব্যবস্থার বিষয় আমরা জেনেছি। এই সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার আছে।

পুকুরখাদে কাজ করার সময় আলোর অভাব ঘটে না এবং বেশ স্বচ্ছন্দেই কাজ করা যায়। কিন্তু পাতালপুরীতে নামলেই অমানিশার অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে আসে, কৃত্রিম আলোর একান্ত প্রয়োজন হয়। সচরাচর খনি-মজুরগণ কেরোসিন ডিবে বা ল্যাম্প ব্যবহার করে। টিনের ডিবে তৈলাধার হিসাবে কাজ করে এবং তার উপর সুতার পলিতা লাগাবার একটি ছোট নল থাকে। ডিবের একপাশে ১২-১৪ ইঞ্চি লম্বা তারের হাতল দেওয়া থাকে। এই হাতলের প্রান্তভাগ হুকের মত বাঁকা। কাজের জায়গায় দেওয়ালে টাঙানো এই কোরোসিন-দীপের আলোতে কয়লা কাটা হয় এবং যাতায়তের পথেও এই বাঁকা হাতল ধরে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা হয়।

ভোজে-কাজে আমরা অনেক সময় কারবাইড-আলোর ব্যবহার করে থাকি। খনিতে এইরূপ এক বিশেষ ধরনের কারবাইড-আলোরও প্রচলন আছে। আলোর গতিকে একমুখী করার জন্য তার একপাশে ধাতুনির্মিত চক্‌চকে একটি চাকতি আঁটা থাকে। এর আলো বেশ জোরালো হয়। তত্ত্বাবধায়ক বা পরিদর্শককে এই আলো দেওয়া হয়। প্রত্যেক মজুরকে এই আলো দিতে হলে খরচা বেশি পড়ে।

নিরাপদ বৈদ্যুতিক টর্চও তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শনের কাজে সাহায্য করে।

আজকাল খনিগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোরও ব্যবহার করা হচ্ছে। মূল সুড়ঙ্গপথ ছাড়াও কাজের জায়গা প্রভৃতি খনির বিভিন্ন অংশও বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা আলোকিত করা হচ্ছে।

কেরোসিন এবং কারবাইড আলোর ব্যবহারে সময় সময় খনিতে ভীষণ দুর্ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে। কোনো খনিতে দাহ্য গ্যাস থাকলে বায়ুমিশ্রিত অবস্থায় সেই গ্যাস যখন উন্মুক্ত শিখার সংস্পর্শে আসে, তখন বিস্ফোরণ ঘটে। অনেক প্রচেষ্টার পর ডেভিস্ সেফটি ল্যাম্প (Davy's safety lamp) নামক বিশেষ ধরনের আলোর প্রচলন এই ভয়াবহ আশঙ্কা দূরীকরণে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য সব খনিতেই দাহ্য গ্যাস বিপজ্জনক পরিমাণে থাকে না। এমন অনেক খনি আছে যেখানে উন্মুক্ত শিখার বাতি সচরাচর ব্যবহার হয়।

এই তো গেল আলোর কথা। এখন কোনো খনিকে যদি একটি রুদ্ধ ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে সেখানে শ্বাসগ্রহণ-উপযোগী বাতাস বা অম্লজান মেলে কি ভাবে? শ্বাসগ্রহণ ছাড়াও খনিগর্ভস্থ মলিন বাতাস ও গ্যাস অপসারণের জন্যও উপযুক্ত মাত্রায় বিশুদ্ধ বাতাসের প্রয়োজন। ভূগর্ভস্থ তপ্ত ও গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের কার্য-ক্ষমতা কমে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এইসমস্ত বিষয়ের উপর দৃষ্টি রেখেই প্রত্যেক খনিতে বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

একটি ঘরে বিভিন্নমুখী দুটি দরজা থাকলে বাতাস এক দরজায় ঢুকে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ভূনিম্নস্থ খাদেও ঠিক এইরূপ হয়। কিন্তু এই স্বাভাবিক বাতাস পর্যাপ্ত নয়। খনির স্থান ও প্রয়োজন বিশেষে আশানুরূপ বাতাস পাওয়া যায় না। তাই খনি-মধ্যে বাতাসের প্রবাহ নিয়মিত ও পর্যাপ্ত করার উদ্দেশ্যে বায়ুনিষ্কাশক পাখার সাহায্য

নেওয়া হয়। একটি শাফটের মুখে এই পাখা বসানো থাকে। ভিতরের অবিশুদ্ধ বাতাস নিষ্কাশন করার সঙ্গেসঙ্গে অন্য শাফটের মুখ দিয়ে বিশুদ্ধ বাতাস খনির মধ্যে প্রবেশ করে। যেসব কাজের জায়গায় বিশুদ্ধ বাতাসের বিশেষ প্রয়োজন শুধু সেইসব দিক দিয়ে এই বাতাস চালনা করা হয়। অব্যবহৃত সুড়ঙ্গের মুখ ইঁটের গাঁথুনি অথবা টিন বা ক্যান্‌ভাসের পরদা দ্বারা ঢেকে দিতে হয়।

কৃত্রিম আলো ও উপরের বাতাস খনির মধ্যে না আনলে যেমন চলে না, খনির জলও বাইরে না পাঠালে সঞ্চিত অবস্থায় খনির কাজ ব্যাহত হয়। ভূপৃষ্ঠে বারিপাতের ফলেই খনিতে এই জলধারার সৃষ্টি হয়। বর্ষার সময় এই জলধারা প্রবলাকার ধারণ করে এবং জলনিকাশ দুরূহ হয়। অতীতকালে কুয়ো থেকে জল তোলার মত বড় বড় ড্রামের সাহায্যে এই জলনিকাশ করা যেত। আজকাল সর্বত্র পাম্পের চলন হওয়ায় এ বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে। পাম্প ও নলের সাহায্যে এই জল বাইরে তুলে ফেলা হয় এবং পুনরায় সে জল যাতে খনির ভিতর প্রবেশ না করতে পারে তার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়। অনেক সময় এই জল শোধন করে পানীয় জল অথবা বয়লারের প্রয়োজনীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে এই জল খনি অঞ্চলের আবাদী ভূমি চাষের সাহায্য করে।

বিস্ফোরণের জন্য অঙ্গারক ও উদজান ঘটিত মিথেন গ্যাস (methane gas) মূলতঃ দায়ী হলেও কয়লার গুঁড়া থেকেও প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তাই এই গুঁড়াজনিত বিপদাশঙ্কা রোধের ব্যবস্থা রূপে সেগুলি জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয় অথবা পাথরের গুঁড়া তাদের উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটা অস্বাভাবিক নয়। বিস্ফোরণের পর খনিগর্ভ থেকে দুর্দশাগ্রস্ত কর্মীদের উদ্ধারসাধন বিশেষ সাহস ও কৌশল-সাপেক্ষ। বিশিষ্ট রকম সাজসরঞ্জামেরও প্রয়োজন হয়।

বিস্ফোরণ ছাড়াও আর-এক প্রকার বিপদ আছে। তা হল খনিস্থ কয়লায় আগুন লাগা। লোকক্ষয়ের দিক থেকে তা এত ভয়াবহ না হলেও ক্ষতির পরিমাণ খুবই বেশি এবং সময় সময় এ আগুন সমূলে নষ্ট করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। ভারতের কয়েক কোটি টন কয়লা এই ধরনের আগুনে বিনষ্ট হয়েছে।

যাই হোক খনিগর্ভে নানারূপ বিপদ এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা গেল। খনির মালিকের হাতে এই দায়িত্ব পালনের গুরুভার দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়, এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। তাই প্রত্যেক কোলিয়ারিতে বা খাদে সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিয়োগ বাধ্যতামূলক বিধান। আইনসম্মতভাবে কাজ করার জন্য ম্যানেজারই সর্বতোভাবে দায়ী। নিরাপত্তামূলক খনিবিধানগুলি কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে কি না তা বিচারের জন্য সরকারের তরফ থেকে পরিদর্শক নিযুক্ত থাকেন।

ধানবাদে অবস্থিত 'ভারতীয় খনি ও ফলিত ভূবিদ্যালয়ে' প্রধানত বিশেষজ্ঞদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়েও এ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। একলব্যের সাধনায় ব্রতী অনেক ছাত্র খনিতে শিক্ষানবিশী করেও এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়।

কয়লার উৎপাদন

খনির গঠন ও খনন-প্রণালীর সঙ্গে উৎপাদনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু কয়লা উৎপাদনের ইমারত নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই তার ভিত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

খনিগুলির মালিকানা-স্বত্ব ও কাঠামো অথবা তাদের পরিচালনার সুব্যবস্থা উৎপাদনের জন্য মূলত দায়ী হলেও শ্রমিকদের স্বার্থ সদিচ্ছা

এবং ক্ষেত্রবিশেষে সরকারের সহযোগিতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমদানি রপ্তানির অনুপাত এবং পরিবহনের সফলতা উৎপাদনের হার বহুলাংশে প্রভাবান্বিত করে। শেষোক্ত দুইটি বিষয়ের সমাধান সরকারী সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।

আমাদের খনিগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—বেসরকারী মালিকের অধীনে বড় খনি, বেসরকারী মালিকের হাতে ছোট খনি, আর সরকার-পরিচালিত বড় খনি। যৌথপ্রথায় চালিত অনেক বড় বড় কোম্পানির হাতে প্রথমশ্রেণীর খনিগুলি রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার লৌহ সিমেণ্ট অথবা জাহাজ প্রভৃতি কোম্পানির মালিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেণ্ট দ্বারাই এইসমস্ত খনি পরিচালিত হয়। ম্যানেজিং এজেণ্টদের সুদক্ষ পরিচালনায় কোম্পানির লাভের অঙ্ক এবং উৎপাদনের হার বাড়ার সম্ভাবনা থাকে সত্য, কিন্তু সময় সময় জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থকে উপেক্ষা করে এই সম্ভাবনাকে ফলবতী করার চেষ্টা করা হয়। সংরক্ষণ-বিরোধী এই প্রচেষ্টা-রোধের জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কোনো বিশেষ পরিবার অথবা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হাতে যেসমস্ত ছোট খনি রয়েছে, তাদের সুষ্ঠু পরিচালনাও যেমন অসুবিধাজনক, অপচয়ের হারও তেমনি অত্যধিক। উৎপাদনবৃদ্ধির প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কোনো যান্ত্রিক সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা এদের নাই, সামর্থ্যেও কুলায় না। উপরন্তু এই ধরনের প্রতিটি খনি অবধি রেললাইন নিয়ে যাওয়া এবং তাদের সময়মত গাড়ি সরবরাহ করা সরকারের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আইনত যে-কোনো দুইটি খনির মাঝামাঝি ৫০ ফুট কয়লা ছাড়ার প্রয়োজন রয়েছে, তার দ্বারা কয়লার প্রভূত অপচয় হয়। পরিবারের কর্তার পরলোকগমনের সঙ্গেসঙ্গে এই খনি যখন বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তখন অবস্থা আরও শোচনীয়

হয়ে পড়ে। কয়লা-শিল্পের জাতীয়করণ অথবা সন্নিহিত ছোট খনিসমূহের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গঠন ব্যতীত এই অসুবিধা ও অপচয় দূরীকরণের কোনো সহজ উপায় নাই।

রেলকোম্পানি-পরিচালিত বড় বড় খনিগুলি বর্তমানে সরাসরি সরকারের নিয়ন্ত্রাধীনে এসেছে। অতীতে এইসব খনি থেকে কোকিং কয়লার যথেষ্ট অপচয় ঘটেছে। এই অপচয়-রোধের প্রতি বর্তমানে সরকারের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারী খনিগুলি আদর্শ খনির স্থান অধিকার করবে বলে আশা করা যায়।

উৎপাদন-হারের তারতম্য ঘটাতে শ্রমিক বা মজুরদের প্রভাব বিশেষ ভাবে দায়ী। এ কথা কয়লা-শিল্পের পক্ষে যতখানি সত্য, অপর যে-কোনো খনিজ অথবা কৃষিজ শিল্পের পক্ষেও ততখানি প্রযোজ্য। তাই কোনো দেশের উৎপাদন বিচারের সময় এই শ্রমিকদের শক্তি ও সামর্থ্য, সদিচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অতীতে কয়লাখনির কাজে বিমুখতা ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু বর্তমানে অন্য শিল্পের তুলনায় এই কাজে অতিরিক্ত সুখ-সুবিধার দরুন খনির জন্য শ্রমিকসংগ্রহে কোনো অসুবিধা হয় না। কয়লাখনির নিকটবর্তী অঞ্চল থেকেই প্রধানত এইসব শ্রমিক সংগৃহীত হয়ে থাকে। পয়সা ও সুবিধার জন্য আজকাল দূরবর্তী অঞ্চলের শ্রমিকও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পরিবারের স্ত্রীপুরুষ সকলেই প্রায় কাজে আসে। আইন অনুযায়ী নারীশ্রমিকদের খনিগহ্বরে কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার পর সচরাচর এরা খনির উপরে গাড়িভর্তি প্রভৃতি কাজের জন্য নিযুক্ত হয়ে থাকে। যেসব পুরুষ শ্রমিকদের বয়স আঠারোর কম, তাদের খনির নীচে কাজ করতে দেওয়া হয় না। খনির ভিতর শ্রমিকদের প্রত্যহ প্রায় আট ঘণ্টা কাজ করতে হয়। বর্তমানে তিন লক্ষেরও কিছু বেশি শ্রমিক এইসব খনিগুলিতে নিযুক্ত রয়েছে।

দৈনিক মজুরি, মাগ্‌গি ভাতা, বাৎসরিক চার মাসের বোনাস, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের স্থবিধা এবং সস্তায় খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি নিয়ে গত মহাযুদ্ধের পূর্বকালীন অবস্থার তুলনায় বর্তমানে একজন খনিশ্রমিকের আয় প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনপ্রতি উৎপাদনের হার পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৩৫ সালের তথ্য অনুযায়ী প্রতি শ্রমিক খনি-গহ্বরে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিকদের হিসাবের মধ্যে ধরে সপ্তাহে গড়ে ৫½ টন কয়লা কাটত, আর এখন সেই হিসাবে ৩½ টন কয়লা কাটা হয়। পাশ্চাত্য যে-কোনো দেশের তুলনায় এই উৎপাদন-হার খুবই কম।

বর্তমানে কয়লার নির্ধারিত মূল্যের প্রায় ৭৫ শতাংশ শ্রমিকদের মজুরির আকারে ব্যয়িত হয়, তবু উৎপাদন কোনো ক্রমেই সন্তোষজনক হচ্ছে না। খনিশ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু তাদের হাতে অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে সে প্রয়োজন সাধিত হয় না। অনেক সময় নেশা করার পর্যাপ্ত পয়সা হাতে থাকার দরুন তারা সপ্তাহে তিন-চার দিনের বেশি কাজে আসতে চায় না। উন্নত বসবাসের ব্যবস্থা, চিকিৎসার জন্য ভালো হাসপাতাল এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয় প্রভৃতি সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রেখে বর্তমানে যেসমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা খুবই শুভজনক ও সুদূরপ্রসারী, কিন্তু এইসঙ্গে শ্রমিকদের মধ্যে যান্ত্রিক উপায়ে কয়লা কাটার পদ্ধতি বিষয়ক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে উৎপাদনের দিক থেকে আশানুরূপ ফললাভ করা সম্ভব হতে পারে। খনিশ্রমিকদের কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানে সেস্ হিসাবে বাৎসরিক প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। শ্রমিকমালিক-বিরোধ-মীমাংসাকারী বোর্ডের হাতেও প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত আছে। নানাভাবে শ্রমিকস্বার্থ অক্ষুণ্ণ হওয়ার পর উৎপাদনের হার লক্ষ্য মাত্রায় পৌছবে বলে দেশ আশা করতে পারে।

উৎপাদনের পরিপোষক হিসাবে শ্রমিক-স্বার্থরক্ষায় সরকারী সহযোগিতার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইসঙ্গে যান্ত্রিক খননপ্রণালীর বহুল

প্রচার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কার্যকরী হতে পারছে না। ছোট ছোট খনিগুলিকে কয়েকটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানে ভাগ ক'রে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের দ্বারা যান্ত্রিক খননপ্রণালী বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করা যেতে পারে। সময়-বিশেষে মালিকদের স্বার্থরক্ষার প্রতি সরকারের আশ্বাসদান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পরিবহনের সুব্যবস্থা ও চাহিদা-সৃষ্টির আকারেও এ আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে। সরকার-নির্ধারিত বিক্রয়-মূল্যের দ্বারাও পরোক্ষভাবে কয়লা-উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়। কয়লার বার্ষিক উৎপাদন ৩৫০ লক্ষ টন ধ'রে, কোন্ শিল্পে কতখানি কয়লার ব্যবহার হয় তার এক সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হল—

ব্যবহার	লক্ষ টন	শতকরা হিসাব
রেলপথ	১১৫	৩৩
কলকারখানা	৪৫	১৩
লৌহ ও ইস্পাত শিল্প	৪৫	১৩
বিদ্যুৎ-উৎপাদন	২৫	৭
কয়লা-খনি	২০	৬
সিমেণ্ট-কারখানা	১৫	৪
ইঁট পোড়ানো	১৫	৪
রাসায়নিক শিল্প ও কাঁচ ইত্যাদি	১০	৩
গৃহস্থালী ও গ্যাস তৈয়ারি	৩৫	১০
জাহাজ ও রপ্তানি	২৫	৭
	৩৫০	১০০

১৯৫০ সালে কয়লার বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৩২৩ লক্ষ টন ; ১৯৫২ সালে তা বেড়ে ৩৬৬ লক্ষ টনে উঠেছে। অনুমান করা যায় ১৯৫৫ সালে এই উৎপাদনের হার ৪১০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে। প্রস্তাবিত নূতন লৌহ-কারখানা এবং সিন্ধীতে অবস্থিত সারের কারখানার জন্য কোকিং কয়লার চাহিদা ক্রমশ

বেড়ে চলবে। কয়লার তাপশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার নিমিত্ত বোকারোয় যে প্রতিষ্ঠান ও সরবরাহ-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, সেখানেও প্রভূত পরিমাণ নিম্নশ্রেণীর কয়লার প্রয়োজন। ঘটিত উপায়ে পেট্রোল তৈরির জন্য যে কারখানা বসার কথা আছে, সেখানেও বার্ষিক ১ লক্ষ টন পেট্রোল উৎপাদনে ৫ লক্ষ হতে ৭ লক্ষ টন নন-কোকিং কয়লার খরচ হবে। সিমেণ্টের নূতন কারখানাগুলিতেও কয়লার চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলবে।

দেশের আর্থিক সুসংগতির জন্য বর্ধিত মাত্রায় রপ্তানির কথাও ভাবা দরকার। অবশ্য সেইসঙ্গে দেখতে হবে যেন তার দ্বারা জাতীয় স্বার্থ ও সংরক্ষণ কোনো মতেই ব্যাহত না হয়। দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া জাপান অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য অনেক স্থানে ভারতীয় কয়লার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কিন্তু একাধিক কারণে গত দু-এক বৎসর যাবৎ এই বিদেশীয় বাজার আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

ভবিষ্যৎ চাহিদার অনুপাতে উৎপাদনের হার উন্নীত করার জন্য এখন থেকেই সর্বতোমুখী চেষ্টার প্রয়োজন। এ বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান, শ্রমিক মালিক এবং সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া হতে পারে না।

কয়লার সদ্ব্যয়

ক্ষমতার বা প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশের মধ্য দিয়েই যেমন মানুষের নৈপুণ্য বা যোগ্যতা বিচার করা হয়, কোনো বস্তুর বা যন্ত্রের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ তার কার্যকরী ক্ষমতার অভিব্যক্তি থেকেই তেমনি বোঝা যায়। পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না— নানারূপ প্রতিবন্ধকতার জন্য অকার্যকরী অবস্থায় এই শক্তির অংশবিশেষ বিনষ্ট হয়। তাই অন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ নিয়েই তুষ্ট হতে হয়।

কয়লার ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। আধুনিক সভ্য জগতে

কয়লার অশেষ প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এতক্ষণ কিছু বলা হল, কিন্তু বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কিভাবে বিশেষ পন্থা বা প্রণালীর মারফত এই দান গ্রহণ করা হয়, তাও আমাদের জানা দরকার। মুখ্যত কয়লার দাহিকা-শক্তির সদ্ব্যবহারই বিভিন্ন প্রণালীর লক্ষ্যবস্তু—ক্ষেত্র বিশেষে অম্লজান অপসারণের ক্ষমতাও কাজে লাগানো হয়। আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলি কখনো গ্যাসের আকারে জ্বালানির কাজ করে, কখনো বা প্রাথমিক উপাদান হিসাবে কৃত্রিম মাখন-শিল্প হতে শুরু করে প্ল্যাস্টিক্ ও রবার শিল্পের বিরাট ক্ষেত্র পর্যন্তও তাদের পরিধি বিস্তার করে। বিভিন্ন প্রণালীগুলির সাধারণ ভাগ পর পর দেওয়া গেল—

ক. দহন বা কম্‌বাস্‌শন্ (combustion)
খ. অঙ্গারক-বর্ধন বা কারবনিজেশন (carbonisation)
গ. গ্যাসীয়করণ (gasification)
ঘ. তৈল ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদন (production of oils and other chemicals)

দহন বা কম্‌বাস্‌শন্

অম্লজানের সহযোগিতা ছাড়া দহন সম্ভবপর হয় না। কয়লার অঙ্গারক ও উদজানের সঙ্গে অম্লজানের সংযোগসাধনে যে দহনের প্রসার হয়, তার দ্বারা প্রভূত পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়। নানাভাবে আমরা এই তাপ-শক্তি আহরণ করি এবং আমাদের কাজে নিযুক্ত করি। কিন্তু এ বিষয় আমরা প্রায় প্রত্যেকেই লক্ষ্য করে থাকব যে, এই দহন স্বতঃস্ফূর্ত নয়—চুলোর মধ্যে কয়লা সাজিয়ে দেশলাই জ্বালালে বাতাসের সংস্পর্শে তাতে আগুন লাগে না। কেরোসিন তেলে ভেজানো ঘুঁটে অথবা কাঠ জ্বালিয়ে কোনো-রকমে এক টুকরা কয়লায় অগ্নিসংযোগ ঘটালে এবং বাতাসের প্রবাহপথ

অব্যাহত রাখলে এই দহন ক্রমশঃ চুলার সমগ্র অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিসংযোজক উষ্ণতা (ignition temperature) বিভিন্ন প্রকার কয়লা ও কোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। বাড়ির সাধারণ উনন থেকেই আমরা দহন সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারি। এ বিষয় গৃহিণীদের অভিজ্ঞতার কাছে বাড়ির কর্তাদের অনেক সময় হার মানতে হয়। চুলায় দেবার কয়লা বা কোকের টুকরাগুলি নির্দিষ্ট আয়তনের হওয়া চাই— বেশি বড় হলে আগুন ধরাতে অসুবিধা হয়, আবার খুব ছোট হলেও আগুন নিভে যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যদি চুলার নীচের মুখে পাখা দিয়ে জোরে হাওয়া দেওয়া যায় তা হলে আগুন নেবে না আর ধোঁয়াও কম হয়। স্যাক্‌রার বা কামারের হাপরের মুখে ছোট কয়লা বা কোকের জোরালো আঁচ অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। আবার কাঁচা কয়লার পরিবর্তে কোকের ব্যবহারে যে দহনের প্রখরতা বৃদ্ধি পায় তাও অনেকের জানা আছে। অন্যদিকে এই কাঁচা কয়লা কোকিং-জাতীয় হলে জমাট অবস্থায় বাতাসের প্রবাহ আংশিকভাবে রোধ করে। বাড়ির আধুনিক চুলায় চিমনির উচ্চতা বাড়িয়ে বাতাসের প্রবাহ জোরালো করার দরুন বাড়ির বিশ্রী আবহাওয়া থেকে গৃহ যেমন রক্ষা পায়, তেমনি দহন-ক্রিয়ার অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টিতে আঁচও বেশ প্রখর হয়। নিয়মিতভাবে খোঁচা দিয়ে ছাই অপসারণ না করলেও চুলা নিবে যেতে দেরি হয় না। বাড়ির ব্যবহারের জন্যে উন্নত ধরনের চুলার বিষয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। টুকরা কয়লা ছাড়াও গোবর মিশ্রিত গুলের আকারে আমরা অনেক সময় গুঁড়া কয়লার ব্যবহার করে থাকি। এইভাবে প্রত্যহ আমাদের রান্না-খাওয়ার কাজে কয়লার তাপশক্তিকে আমরা সরাসরি নিয়োগ করি। ইঁট পোড়াবার জন্যও তাপশক্তির এই সহজ সদ্‌ব্যবহার করে থাকি। এই উভয় ক্ষেত্রেই দহনের সম্পূর্ণতাই হল একমাত্র লক্ষ্য, কারণ এর হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে কয়লার কর্মক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষভাবে জড়িত।

যখন আমরা এই তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে অথবা বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপ দিতে যাই, তখন আরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এবং সে কারণে ক্ষমতাও (efficiency) কমে যায়। বয়লারের সাহায্যে জলের বাষ্পীকরণ (steam raising) ছাড়া প্রধানত এই রূপদান সম্ভবপর হয় না। চায়ের কেটলির মুখে বাষ্প নির্গত হওয়ার দরুন কেটলির মৃদু কম্পন কারোর দৃষ্টি এড়ায় না। বাষ্প-উদ্ভূত এই কম্পনই হল যান্ত্রিক শক্তি সঞ্চালনের ভিত্তি স্বরূপ। এরই সাহায্যে ট্রেন চলছে জাহাজ চলছে, অল্পবিস্তর সমস্ত কেন্দ্রীয় শক্তিসরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি এরই উপর নির্ভরশীল। কয়লা হতে প্রাপ্য সমস্ত তাপশক্তিটুকু যদি পূর্ণদহনের সাহায্যে পুরোপুরিভাবে জলের বাষ্পীকরণের জন্য নিযুক্ত করা যেত এবং এই বাষ্পশক্তির সবটুকু যদি যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হত তা হলে আদর্শ পরিস্থিতির উদ্ভব হত সন্দেহ নেই, কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় কোনোক্রমেই তা হতে পারে না। বাতাসের প্রবাহ যতই পরিমিত এবং নিয়মিত করা হোক না কেন, নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পূর্ণদহন ব্যাহত হয়। বয়লার-ঝাড়া ছাই এবং চিমনির মুখে কালো ধোঁয়া দেখেই তা উপলব্ধি করা যায়। দ্বিতীয়ত প্রাপ্ত তাপশক্তির অনেকখানিই অকার্যকরী অবস্থায় অর্থাৎ বাষ্পীকরণের কাজে না লেগেই বায়ুমণ্ডলে লীন হয়। বিকিরণ-জনিত তাপশক্তির ক্ষয়ও কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে বয়লারে খর-জল (hard water) ব্যবহারের দরুন ভিতরের গায়ে যে কঠিন আবরণ পড়ে, তার দ্বারাও বাষ্পাকরণ ব্যাহত হয়।

আজকাল যেসমস্ত নূতন ধরনের বয়লারে কয়লার চূর্ণ পোড়াবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার দ্বারা কর্মক্ষমতা যে শুধু বাড়ানো সম্ভব হয়েছে তা নয়—বেশি ছাইযুক্ত কয়লা অথবা ধোতাবশিষ্ট নিকৃষ্ট কয়লার ব্যবহারও সম্ভবপর হয়েছে। বোকারোর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে কয়লার চূর্ণ পুড়িয়ে প্রথমে যে তাপশক্তি আহরণ করা হয় তার জন্য ২৭ হতে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত

ছাইযুক্ত কয়লার ব্যবহার চলছে। এই তাপশক্তিই অত্যুত্তপ্ত (super heated) বাষ্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই কেন্দ্র হতে প্রতি ঘণ্টায় ২,০০,০০০ কিলো-ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি বিতরিত হবে। তবে বর্তমানে ১৫০,০০০ কিলো-ওয়াট মাত্র তৈরি করা হচ্ছে।

অঙ্গারক-বর্ধন বা কারবনিজেশন

বিভিন্ন উষ্ণতায় কঠিন ও নরম কোক তৈরির কথা আগেই বলা হয়েছে। অন্তর্ধূম-পাতনের (destructive distillation) প্রভাবে কয়লা প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত হয়। অঙ্গারক-বহুল কঠিন বা ঝামা-সদৃশ অংশকেই কোক বলে। এই কোকের সরন্ধ্রতা দহনের সহায়তা করে এবং তার মধ্যে অঙ্গারক কণাগুলি দৃঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকায় দহনকালীন বায়ুপ্রভাবে স্থানচ্যুত হয় না। উদ্বায়ী অংশ হিসাবে দ্বিতীয় ভাগ দহনের জন্য নিযুক্ত হতে পারে; কখনও-বা মহামূল্যবান উপজাতের (by-products) আধার রূপে আদর পায়। কোক-শিল্পের ক্ষেত্রে কোকই হল মুখ্য বস্তু, উদ্বায়ী অংশ বা গ্যাস হল গৌণ। তাই নির্ধারিত গুণবিশিষ্ট কোক তৈরির প্রতিই বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়। এই ভাবে প্রাপ্ত গ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে দহনের জন্য নিযুক্ত না করে উপজাত সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেই তার সম্যক্‌ব্যবহার করা হয়। তার পর এই গ্যাস দহনার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। গ্যাস-শিল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু কোক উপজাতরূপে পরিগণিত হয় এবং গ্যাসের পরিমাণ এবং প্রকৃতির উৎকর্ষতাই বিশেষভাবে কাম্য হয়। গ্যাস-শিল্পের কঠিন কোক অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধাতু-নিষ্কাশন-উপযোগী কোক রূপে বিবেচিত হয় না। কয়লা নির্বাচনের সময়ই এই দুই বিভিন্নমুখী চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এখনও পর্যন্ত উভয়ের ক্ষেত্র পৃথক্ এবং প্রতিযোগিতামূলক নয়। তবে উন্নত কারবনিজেশন-প্রক্রিয়ার আবিষ্কারে একে অপরের ক্ষেত্রেও আধিপত্য

গ্রহণের চেষ্টা করছে। নানা অসুবিধার জন্য নরম কোক তৈরির এবং তার উপজাত সংগ্রহ বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করে নি, কঠিন কোক শিল্পেরই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। অধুনা নরম কোক শিল্পের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং দুয়ের মাঝামাঝি ৮০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে মিডিয়াম টেম্পারেচার কারবনিজেশন (medium temperature carbonisation) গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে।

কোক-শিল্পের জন্য তাপসহ ইঁটের চুলা বিভিন্ন মডেল বা গঠন অনুযায়ী তৈরি করা হয়। এক ধরনের চুলা আছে যার গঠন অনেকটা মৌচাকের মত। তাই তার নামকরণ হয়েছে বিহাইভ্ ওভেন (Beehive oven)। নানারূপ অসুবিধা ও অপচয়ের কথা বিবেচনা করে এই চুলার ব্যবহার দিন দিন কমে আসছে। গ্যাসের অন্তর্নিহিত তাপশক্তির সদ্ব্যবহার করে উন্নত উপায়ে কারবনিজেশন করার উদ্দেশ্যে এবং উপজাতগুলির উদ্ধার সাধনের নিমিত্ত নানাপ্রকার আধুনিক কোক-চুলার আবিষ্কার হয়েছে। তার মধ্যে সাইমন কার্ভস (Simon-Carves), কপার্স (Koppers) প্রভৃতি চুলার নাম উল্লেখযোগ্য। সারিবন্দীভাবে এইরূপ ৫০-৬০টি চুলা একত্রে কাজ করে। চুলায় দেবার জন্য অধিকাংশ কয়লা $\frac{3}{8}$ ইঞ্চির নীচে ভাঙা হয়। ৪ টন কয়লা হতে প্রায় ৩ টন কোক পাওয়া যায়। কোক হওয়ার পর তা বাইরে এনে জল দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়। বিভিন্ন চুলায় উৎপন্ন গ্যাসও বড় নল দ্বারা চালিত অবস্থায় জলধারায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়। আলকাতরা-জাতীয় পদার্থ, বেঞ্জল এবং তরল অ্যামোনিয়া এই সময় পৃথকভাবে সংগ্রহ করা হয়। এর পর এই গ্যাস সারিবন্দী চুলার দহনেই নিযুক্ত করা হয় এবং শতকরা ৫০ ভাগ উদ্বৃত্ত গ্যাস অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। পাতনের সাহায্যে আলকাতরা হতে মোটামুটিভাবে বেঞ্জল, কার্বলিক অ্যাসিড, ন্যাপথ্যালিন, ক্রিয়োজট তেল, অ্যানথ্রাসিন তেল এবং পীচ প্রভৃতি উদ্ধার করা হয়। এগুলিই আবার

বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্থান অথবা মূল উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে বেঞ্জলের উপকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। এই বেঞ্জলই হল নানাজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্যের ভিত্তি স্বরূপ। এরই পল্লবিত শাখা-প্রশাখায় বহুবিধ শিল্প গড়ে উঠেছে। রঞ্জক, বিস্ফোরক, ভেষজ এবং কীটপতঙ্গ-প্রতিষেধক বিবিধ দ্রব্য তৈরির জন্য এবং দ্রাবক হিসাবে বেঞ্জল এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এককথায় এই বেঞ্জল দশ হাজার ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের জনক।

নরম কোক তৈরির সময় আলকাতরা-জাতীয় পদার্থ কিছু বেশি পাওয়া যায় এবং গ্যাসের ভাগ কম হয়।

গ্যাস-শিল্পের ক্ষেত্রে তাপসহ মৃত্তিকা-নির্মিত বিশেষ প্রকার বকযন্ত্র বা রিটর্টের (retort) সাহায্য নেওয়া হয়। উৎপন্ন গ্যাস দ্বারাই এই রিটর্ট উত্তপ্ত করা হয়। এখানেও আলকাতরা ও তরল অ্যামোনিয়া সংগ্রহের পর এই গ্যাস হতে গন্ধকজাতীয় অশুদ্ধি দূর করা হয় এবং পাত্রে সঞ্চিত অবস্থায় শহরের সর্বত্র গ্যাস সরবরাহ করা চলে।

গ্যাসীয়-করণ বা গ্যাসিফিকেশন

রুদ্ধ অবস্থায় তাপ-প্রয়োগে কয়লা থেকে যে গ্যাস নির্গত হয়, তার প্রস্তুতকরণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পেয়েছি। কিন্তু কয়লায় উদজানের পরিমাণ কম এবং সীমাবদ্ধ থাকায় এই কয়লার মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ উদজান পাওয়া সম্ভবপর নয়। অথচ দহনের ফলে অঙ্গারক অপেক্ষা উদজানে অনেক বেশি তাপ পাওয়া যায়। আবার এই ঘটিত গ্যাসের সাহায্যে নানারূপ রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতির জন্যও এই উদজানের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অ্যামোনিয়া তৈরির সময় এর সঙ্গে সোরাজানেরও দরকার হয়। অঙ্গারাম্ল গ্যাসের তাপদানক্ষমতা কিছুমাত্র নাই, কিন্তু

অর্ধদগ্ধ অঙ্গারক হতে যে কার্বন মনোক্সাইড্ (carbon monoxide) গ্যাস সৃষ্ট হয় তার দহনে তাপশক্তি পাওয়া যায়। এই কার্বন মনোক্সাইড্ ও উদজানের সংমিশ্রণ (water gas) দহনের জন্য ব্যবহার করা হলেও মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যাদির মূল উপাদান হিসাবেই বেশি সমাদর পায়। জ্বলন্ত কোকের মধ্যে জলীয় বাষ্প প্রয়োগ দ্বারা ওয়াটার গ্যাস তৈরি করা হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অন্যান্য ঘটিত গ্যাসের মধ্যে প্রডিউসার গ্যাসের (Producer gas) নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্বলন্ত কোকের মধ্যে পরিমিত বাতাস ও বাষ্প একযোগে পাঠালে কার্বন মনোকসাইড, উদজান ও সোরাজানের যে সংমিশ্রণ পাওয়া যায় তা প্রডিউসার গ্যাস নামে অভিহিত হয়। প্রডিউসার গ্যাস অপেক্ষা ওয়াটার গ্যাসের তাপশক্তি-দানের ক্ষমতা বেশি। এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্যাস অল্পবিস্তর এই দুইয়েরই সংমিশ্রণ। প্রয়োজনমত এর সঙ্গে পেট্রোলজাতীয় গ্যাস মিশিয়ে তাপদান-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো যায়।

তৈল এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন

কয়লার মধ্যে উদজানের ভাগ কম থাকায় গ্যাসের আকারে মৌলিক উদজান মিশ্রণের দ্বারা তাপশক্তি-বৃদ্ধির কথা জানা গেল। কিন্তু এই অতিরিক্ত উদজান দ্বারা অঙ্গারকের সঙ্গে ঘটিত ক্রিয়ায় পেট্রোল-জাতীয় পদার্থ সংগ্রহও সম্ভবপর হয়েছে। অবশ্য এর জন্য বিশেষ প্রকার চাপ ও উষ্ণতার প্রয়োজন। বার্জিয়াস এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক। সাধারণ বায়ুমণ্ডলের চাপ অপেক্ষা ২০০ হতে ৭০০ গুণ চাপ এবং ৪০০ হতে ৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার প্রয়োগ দ্বারা এই প্রক্রিয়া সাফল্যলাভ করেছে। এই উপায়ে কয়লার প্রায় ষাট শতাংশ পেট্রোল-জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তবে সমগ্র শক্তি খরচের পরিমাপে বিচার করলে এক টন পেট্রোলের

জন্য ৫-৬ টন কয়লা খরচ হয়। লিগনাইট বিটুমিনাস্ প্রভৃতি কয়লা এ কাজে ব্যবহৃত হয়। নরম কোক হতে প্রাপ্ত আলকাতরাও এই কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী বিবেচিত হয়েছে। এইভাবে প্রস্তুত পেট্রোল-জাতীয় পদার্থের উপজাতগুলি নানাপ্রকার কাজে নিযুক্ত করা হয়। বিমান-চালন উপযোগী উচ্চশ্রেণীর তেল বার্জিয়াস-প্রক্রিয়ার দ্বারা পাওয়া যায়।

ওয়াটার গ্যাস হতে ফিশার ট্রপ্স্ (Fisher Tropsch) প্রক্রিয়ায় যে পেট্রোল পাওয়া যায় তার জন্য ১৮০ হতে ২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা এবং বিশেষ প্রকার অনুঘটকের সান্নিধ্য প্রয়োজন হয়। এ প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর সমাদর লাভ করছে। এ ক্ষেত্রেও এক টন পেট্রোলের জন্য প্রায় ৫-৬ টন কয়লার দরকার। উভয়বিধ প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত পেট্রোল বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হওয়ায় দুইয়ের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র এক নয়। ফিশার ট্রপ্স্ প্রক্রিয়ার দ্বারা যে-কোনো শ্রেণীর কয়লা বা কোককে কাজে লাগানো যেতে পারে।

এই তেল ছাড়াও কয়লার আরও দু-একটি বিশেষ ব্যবহার আমাদের জানবার আছে। ক্যালশিয়াম কারবাইড (calcium carbide) অ্যাসেটিলিন (acetylene) গ্যাস তৈরির জন্য একান্ত প্রয়োজন। এই অ্যাসেটিলিন প্ল্যাস্টিক ও রেয়ন শিল্পের প্রাথমিক উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। ঘটিত রবার তৈরির কাজেও এর প্রয়োজন আছে। অত্যধিক উষ্ণতা সৃষ্টির জন্য অ্যাসেটিলিন গ্যাসের প্রচলন সর্বজনবিদিত। বিশেষ প্রকার উষ্ণতায় কোক ও চুনের যৌগিক পদার্থরূপে ক্যালশিয়াম কারবাইড প্রস্তুত করা হয়।

সক্রিয় অঙ্গার (active carbon) দ্বারা চিনিকে সাদা অবস্থায় পাই এবং অন্যান্য নানাপ্রকার তেল ও গ্যাস শোধন করা হয়। এই সক্রিয় অঙ্গার কয়লা থেকেই তৈরি করা যেতে পারে।

ইলেক্ট্রোড কার্বন (electrode carbon) পাওয়ার জন্যও আমাদের

কয়লার মুখাপেক্ষী হতে হয়। এই ইলেকট্রোড কার্বন অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুনিষ্কাশনে বিশেষ প্রয়োজন।

গন্ধকাম্ল (sulphuric acid) সহযোগে কয়লাকে জিয়োকার্বে (zeocarb) বা কার্বিয়নে (Carbion) পরিণত করে জলের খরতা দূর করার কাজেও নিয়োজিত করা হচ্ছে।

নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় অম্লজান আবহাওয়ার মধ্যে কয়লাকে হিউমিক অ্যাসিডে (Humic acid) পরিণত করাও সম্ভব। পরে এর থেকে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করা যেতে পারে।

কয়লার অপচয়

অপপ্রয়োগ অথবা অমিতব্যয় অর্থেই 'অপচয়' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সকল সময়েই যে এই অপচয় ইচ্ছাকৃত তা নয়, অজ্ঞানতাবশত অথবা অদূরদর্শিতার জন্যও তা ঘটতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সময়ই হয়তো আমরা লাভ-লোকসানের খতিয়ান বিচার করে চলি, কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে জাতীয় জীবনে এই দোষ যে পঙ্গুতা ঘটায় তা বুঝতে দেরি হয় অথবা ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে তার জের টানতে হয়। দৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা দূরদর্শিতা বা পরিকল্পনার যে অভাব বোধ করি তার দ্বারা তখন কোনো বিশেষ ফললাভ হয় না। অথচ একবারও ভেবে দেখি না যে, প্রকৃতির সম্পদ যতই অপর্যাপ্ত হোক-না কেন, তার সবটুকুই আমাদের নয়— দেশের ভবিষ্যৎ জনগণও তার সমান অংশীদার। আবার যখন এই সম্পদের অপ্রাচুর্য থাকে তখন এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। ভারতের কয়লার মুখ তাকিয়ে আমাদেরও আজ এ কথা ভালোভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

আমাদের গৃহস্থালীর কথা প্রথম ধরা যাক। যেভাবে আমরা কলের

জল পাই, সেইভাবে যদি পাম্পের সাহায্যে কয়লার গ্যাস আসে প্রতিটি ঘরে, আর বিশেষ ধরনের চুলায় বা স্টোভে যদি সে গ্যাস জ্বালানো হয়, তাহলে ব্যবহারিক দিক হতে আমাদের কত সুবিধা হয়। প্রথমত যখন ইচ্ছা নলের ছিদ্রমুখ খুলে আমরা সঙ্গেসঙ্গে আগুন জ্বালাতে পারি, আবার যখন ইচ্ছা বন্ধ করা চলে। এতে তাপক্ষয় হয় কম। দ্বিতীয়ত ধোঁয়া বা ছাইএর দৌরাত্ম্য মোটেই থাকে না। সংক্ষিপ্ত সময়ে এবং গৃহের পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখেও এই গ্যাসের আগুন খুব ভালো হয়— বাড়ির সাধারণ উনুনে তা পাওয়া সম্ভবপর হয় না। অথচ সমগ্রভাবে বিচার করলে এই গ্যাসের রান্নায় কয়লার খরচ হয় কম, কারণ বর্তমান চুলায় রান্নার আগে বা পরে যে তাপশক্তির অপচয় ঘটে তার পরিমাণ খুব সামান্য নয়। বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত গ্যাসের কারখানায় সর্বতোভাবে এই অপচয়-রোধের চেষ্টা চলে। সেইসঙ্গে কোক এবং প্রয়োজনীয় উপজাতগুলিও সংগ্রহ করা হয়। আমাদের দেশে বড় নগরী থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট শহরে প্রতিদিন যে কয়লা খরচ হয় তার অনেকখানি এই গ্যাসের প্রচলন দ্বারা কমাতে পারা যায়। কলের জলকে আমরা যেভাবে মেনে নিয়েছি, গ্যাসকেও সেইভাবে মেনে নিতে হবে। প্রসঙ্গত এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক অগ্নিসংযোজনার কাজে ঘুঁটের আকারে প্রতিদিন যে অজস্র গোবর নষ্ট হচ্ছে, তা উৎকৃষ্ট সাররূপে ভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য নিযুক্ত হতে পারে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গ্যাসের রান্না খুবই জনপ্রিয়। সুদূর গ্রাম পর্যন্ত তা প্রসারলাভ করেছে। আমাদের দেশেও আমরা এ শিল্প সহজেই গড়ে তুলতে পারি। শুধু শিল্পপতিদের দূরদৃষ্টি এবং সর্বতোমুখী প্রচেষ্টার প্রয়োজন। হতভাগ্য দেশে তারও অভাব ঘটলে সরকারী সাহায্য এবং সহানুভূতির মুখাপেক্ষী হতে হবে।

এক বৃহৎ পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে এই গ্যাসের সাহায্যে কোনো কোনো দেশে কয়লা-অঞ্চলের দূরবর্তী বড় বড় কারখানাও চালানো

হচ্ছে। ভূগর্ভস্থ অবস্থায় খনিতেই কয়লাকে গ্যাসে পরিণত করে ভূনিম্নস্থ বড় বড় নলের সাহায্যে এই গ্যাস শিল্পাঞ্চলে পাঠানো সম্ভবপর। খনির গঠন এবং অবস্থানের উপরেই তার সফলতা নির্ভর করে। এর জন্য এককালীন ব্যয় বেশি হলেও চলিত ব্যয় কমই হয়। এই ব্যবস্থায় সবচেয়ে সুবিধা হল যে; পরিবহনের চাপ এর দ্বারা অনেকখানি লাঘব করা যায়। আমাদের দেশেও হয়তো এমন একদিন আসবে যখন আসানসোল অঞ্চলের কিছু কয়লা গ্যাসের আকারে এইভাবে কলিকাতা পর্যন্ত পাঠানো চলবে এবং এদের মধ্যবর্তী অঞ্চলেও অনেক শিল্প গড়ে উঠবে। আশার কথা, সমগ্র দামোদর উপত্যকা অঞ্চলে কোক-চুলার উদ্বৃত্ত গ্যাস ও আধুনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত উচ্চশ্রেণীর ঘটিত গ্যাস সরবরাহের জন্য সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্গাপুর অঞ্চলে এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেছে।

এ ছাড়াও উন্মুক্ত স্থানে রাশিকৃত কয়লা পুড়িয়ে দিনের পর দিন যে 'নরম কোক' তৈরি হয়, তার দ্বারা আমরা কয়লার ওজনের প্রায় ২/৫ অথবা ১/৩ মূল্যবান অংশ ধোঁয়ার আকারে মিছামিছি নষ্ট করি। অথচ এই ধোঁয়া থেকেই নানা-প্রকার উপজাত এবং দহনোপযোগী গ্যাস সংগ্রহ করা চলে। এই অপচয় নিবারণের জন্য কোক নির্মাণের উন্নত চুলার সাহায্যেই কেবলমাত্র কোক তৈরি হওয়া উচিত এবং উপজাত ও গ্যাস সংগ্রহের প্রতি যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অপচয় হয়েছে ধাতুনিষ্কাশন-উপযোগী কোকিং কয়লার। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, আগামী ৬০ বৎসরের মধ্যে যখন এই কয়লা শেষ হয়ে যাবে তখন প্রচুর পরিমাণ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লৌহপ্রস্তর থাকা সত্ত্বেও লৌহ-কারখানাগুলির অবস্থা বর্তমানের পাটকল অথবা কাপড়ের কলের অনুরূপ হবে। অন্যদেশ হতে কোকিং কয়লা সরবরাহের উপর লৌহশিল্পের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করবে।

দু-এক সাল আগেও প্রতি বৎসর আমাদের খনিগুলি হতে ১৩০ লক্ষ টন কোকিং কয়লা তোলা হত, অথচ তার ১/৩ অংশ মাত্র ধাতুনিষ্কাশনের জন্য

ব্যবহৃত হয়েছে। এতদিন পর আমরা এ বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করছি এবং আইন প্রণয়ন দ্বারা কোকিং কয়লার উৎপাদন পরিমিত করার ব্যবস্থা হয়েছে।

উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৩৩ ভাগ বা ⅓ অংশ রেল-চলাচলের জন্য ব্যয়িত হয়, এ হিসাব আগে জেনেছি। কিন্তু এই ব্যবহৃত কয়লার শতকরা ৫০ ভাগ কোকিং জাতীয়। এ সম্বন্ধে রেল-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং নূতন ধরনের যে সমস্ত এঞ্জিন আমদানি করা হচ্ছে তাতে ২৪ শতাংশ পর্যন্ত ছাইযুক্ত নন-কোকিং কয়লার ব্যবহার চলবে। আরও উন্নত উপায়ে কয়লার চূর্ণ পোড়াবার ব্যবস্থা রাখলে রেল-বিভাগের বর্তমান কয়লা খরচের হার মাত্র ½ অথবা ⅓ ভাগে দাঁড় করানো সম্ভবপর হতে পারে। ধৌতিকরণের দ্বারা কোকিং কয়লার অংশবিশেষ কঠিন কোক তৈরির জন্য নিযুক্ত ক'রে বাকী অংশ লোকো-মোটিভ এঞ্জিনে ব্যবহার করা উচিত। ট্রেন চালাবার কাজে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার করেও কয়লার সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

শুধু কোকিং কয়লাই নয়, নন্-কোকিং কয়লার অপচয়ও কম হয় না। অনুন্নত বয়লারে অহেতুক কয়লার ব্যয়বৃদ্ধি আর পুরাতন বয়লারের ছিদ্রপথে অকারণ বাষ্পের অপচয় যে কয়লারই অপচয় সে কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। খনিগুলিতে শক্তিসরবরাহের কাজে কেবলমাত্র তৃতীয়শ্রেণীর কয়লার বরাদ্দ থাকা দরকার, অন্তত কোনোক্রমেই প্রথমশ্রেণীর কয়লা ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়। অধিক ছাইযুক্ত কয়লা অথবা ধৌতাবশিষ্ট কয়লার চূর্ণ পোড়াবার ব্যবস্থা রেখে আঞ্চলিক শক্তিসরবরাহ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারা যায়। তার দ্বারা সহজেই খনিসমূহের প্রয়োজনীয় শক্তিসরবরাহ সম্ভবপর হবে।

কয়েক বৎসর আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার যে শিল্পবিশেষজ্ঞ দল এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মতে উন্নত ধরনের বয়লারে ৩২ শতাংশ ছাইযুক্ত কয়লা তো ব্যবহার করা চলেই, উপরন্তু উন্নত উপায়ে কয়লার চূর্ণ পোড়াবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাইযুক্ত কয়লার ব্যবহার সম্ভবপর হতে পারে।

অথচ বর্তমানে আমাদের দেশে কয়লার ছাই শতকরা ৩৫ ভাগের বেশি হলে তা কয়লা হিসাবে বিক্রয়যোগ্য নয়।

যুক্তি এবং ব্যয়সম্মতভাবে (rationally and economically) কয়লা ব্যবহারের কোনো বিশেষ প্রচেষ্টাই এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে হয় নি। অথচ কয়লার অপচয় নিবারণের প্রথম সোপানই হল বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কয়লার নির্বাচন। অপপ্রয়োগজনিত অপচয়কেই আজ আমাদের দৃঢ়ভাবে রোধ করতে হবে।

এইসঙ্গে খনিগুলি শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জাতীয় সম্পত্তি— এই সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই উন্নত ধরনের খনন-প্রণালী গ্রহণ করা কর্তব্য এবং সমস্ত খনিগুলিতেই বালুভরাট দ্বারা প্রাপ্ত কয়লার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলা একান্ত আবশ্যক। ছোট খনিগুলির সংখ্যাহ্রাস এবং স্থানবিশেষে একত্রীকরণের কাজও ত্বরান্বিত হওয়া প্রয়োজন। উৎপন্ন কয়লার ১/৩ ভাগ যে টুক্‌রার (slack) আকারে পাওয়া যায়, সেগুলির ব্যবহারের জন্যও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। শিল্পাঞ্চল এবং কয়লাখনি সংলগ্ন কারখানাগুলিতে মিতব্যয়িতার সঙ্গে কয়লা খরচ করার বিষয় সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। উপরিউক্ত অনেক সমস্যার প্রতিই আমাদের জাতীয় সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

কয়লার গবেষণা

মিতব্যয়ী হওয়া মানে কৃপণ হওয়া নয়। তাই একদিকে অপব্যয়ের পথ রোধ করাও যেমন প্রয়োজন, অপর দিকে ভারতের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে শিল্পপ্রসার ত্বরান্বিত হওয়াও তেমনি একান্ত দরকার। কি পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হয়েছে অথবা কি ধরনের সম্পদ আমাদের নেই— এ চিন্তায় কালক্ষেপ না করে কিভাবে আমাদের হাতের সম্পদ দ্বারা শিল্পোন্নতির সাহায্য করতে পারি তার উপায় উদ্‌ভাবন করতে হবে। তাই কয়লার সংরক্ষণ এবং সদ্‌ব্যবহারের

(conservation and utilization) উপর লক্ষ্য রেখেই আমাদের গবেষণা শুরু করতে হয়েছে। শিল্প-সম্প্রসারণের প্রথম সোপানে কয়লার আশু অবদানের প্রতি যত্নবান হব সত্য, কিন্তু মৌলিক গবেষণার (fundamental research) দিক থেকেও অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশসমূহের সমপর্যায়ে না থাকলে চলবে না, কারণ এই মৌলিক গবেষণাই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করবে এবং দেশের সম্পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধি করবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'জাতীয় জ্বালানি গবেষণাগার' এই মহাব্রতের ভার নিয়েছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল দেশের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে পূর্ণসহযোগিতা করা। তাই গবেষণাগারের গবেষণার মধ্যেই এর পরিধি সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিল্পসম্ভাবনার উপযোগী পাইলট প্ল্যাণ্টস্ (pilot plants) চালু করে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ, প্রকৃতি ও আসন্ন মূল্য প্রভৃতির খতিয়ান জানিয়ে দেওয়া হবে। শিল্পপতিগণ, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার তার উপর ভিত্তি করেই বড় বড় কারখানা স্থাপনের কথা বিবেচনা করবেন অথবা সেসব বিষয়ে যত্নবান হবেন। দেশীয় শিল্পগুলির বর্তমান সমস্যা সমূহের সহজ সমাধানকল্পেও এই গবেষণাগার বিশেষ আগ্রহশীল।

এই সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের প্রধান প্রধান প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য কি ধরনের গবেষণা চলছে, মোটামুটিভাবে তারই হিসাব নেওয়া যাক।

সংরক্ষণ

কোকিং কয়লার অপর্যাপ্তির কথা ভেবে সর্বাগ্রে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন। এই ধরনের মজুত কয়লার পরিমাণ বাড়ানো আমাদের সাধ্যের বাইরে, তবে কতকগুলি ত্রুটি— যথা, অত্যধিক ছাই, গন্ধক অথবা ফস্‌ফোরাস্ থাকার দরুন

যেসমস্ত কোকিং কয়লা ধাতুনিষ্কাশনের অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয় তাদেরকে কোনোভাবে ব্যবহার-উপযোগী করা যায় কিনা তাই দেখা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত যেসমস্ত কয়লার কোকে নির্ধারিত কাঠিন্য (caking index) পাওয়া যায় না অথচ তাদের মধ্যে উপরিউক্ত দোষগুলি নাই, তাদের সদ্ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। এই দুইটি বিষয়ের সমাধানের উপরেই কয়লার সংরক্ষণ অনেকখানি নির্ভর করছে।

চাল বা গমের পাথর বাছাই আমাদের নিত্যকার এক সাধারণ ঘটনা। এই বাছাই আমরা মোটামুটি দুইভাবে করে থাকি— কুলোর সাহায্যে ঝেড়ে অথবা জলের মধ্যে ফেলে। পাথরগুলি মোটা হলে বাছাই করা সহজ হয়, আর মিহি হলে বাছাই করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিশুদ্ধ কয়লা হতে অজৈব পদার্থগুলির পৃথকীকরণও অনেকটা এই রকম। তাই অজৈব পদার্থের আকার ও আপেক্ষিক গুরুত্বের সুবিধা নিয়েই সেগুলি কয়লা থেকে পৃথক করা হয়। একেই কয়লার বিশুদ্ধিকরণ অথবা ধৌতিকরণ (cleaning or washability) আখ্যা দেওয়া হয়। 'কয়লা ধুলে ময়লা যায় না' এই আমাদের চলতি প্রবাদ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই ময়লাও আংশিকভাবে দূর করা চলে। তবে ময়লা অর্থে যদি কালো রং হয় তা হলে সে কথা স্বতন্ত্র। কয়লার প্রকৃতির উপর এই ধৌতিকরণের সাফল্য নির্ভর করছে। অজৈব পদার্থের স্তরগুলি মোটা হলে এই ধৌতিকরণ সহজসাধ্য হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের অধিকাংশ কয়লার অজৈব পদার্থগুলি হয় সূক্ষ্ম স্তরে কিংবা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে এই কাজ অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য।

সাবান-গোলা জলের ফেনার অনুরূপ বাতাস তেল ও জলের সংমিশ্রণে উদ্ভূত ফেনার (froth flotation) সাহায্যেও কয়লার গুঁড়া থেকে অবিশুদ্ধিগুলি অপসারণ করা সম্ভব। খরচ কিছু বেশি হলেও এই ধরনের পৃথকীকরণ ভারতীয় কয়লার পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

আমাদের দেশে এমন অনেক কয়লা রয়েছে যার ছাইএর পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হতে ৩৫ ভাগের মধ্যে, অথচ সেগুলির দ্বারা ভালো কোক প্রস্তুত করা চলে। আংশিক বিশুদ্ধিকরণের দ্বারা যদি এই ছাইএর পরিমাণ শতকরা ১৫ ভাগের নীচে নামানো যায় এবং এই বিশুদ্ধ অংশের পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগও হয়, তবু সংরক্ষণের দিক হতে তা জাতির পক্ষে শুভজনক হবে। এর দ্বারা বাকি ৫০ ভাগে ছাইএর পরিমাণ বেড়ে হয়তো শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগের মধ্যে দাড়াবে, কিন্তু এগুলি উন্নত ধরনের বয়লারে, ইট-পোড়ানোর কাজে এবং সিমেণ্ট প্রভৃতি কারাখানায় ব্যবহার করা চলবে। যান্ত্রিক খননকার্য বেশি মাত্রায় চালু হলে এই বিশুদ্ধিকরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। এখানে বলা বাহুল্য যে, এই ছাইএর সঙ্গে অনেক পরিমাণে অজৈব গন্ধক এবং ফস্‌ফোরাসও বিদূরিত হয়।

আশার কথা এই যে, কয়লার এই আংশিক বিশুদ্ধিকরণের জন্য টাটা কোম্পানির প্রচেষ্টায় ও সহায়তায় পশ্চিম বোকারো এবং জামাডোবায় দুইটি কারখানা স্থাপিত হয়েছে। প্রথমটিতে ঘণ্টায় ১৩৫ টন এবং দ্বিতীয়টিতে ঘন্টায় ৩০০ টন কয়লা শোধন করা চলে। গবেষণাগারের প্রাপ্ত ফলাফল এর জন্য অনেকখানি কৃতিত্বের দাবী করতে পারে।

আগেই জেনেছি যে, আসামের কয়লার কোক খুব ভালো হয়, কিন্তু বেশি গন্ধক থাকার দরুন তা লৌহশিল্পের ব্যবহারে আসে না। এই গন্ধক বিতাড়ন সম্ভবপর হলে আমাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হবে। এই গন্ধক বিতাড়ন বর্তমান গবেষণার এক অঙ্গ।

রাণীগঞ্জ বা মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলে এমন অনেক কয়লা রয়েছে যার কোকে নির্ধারিত কাঠিন্য পাওয়া যায় না, অথচ তার ছাইএর পরিমাণ খুব কম। এর সঙ্গে ঝরিয়া বা বোকারো অঞ্চলের বেশি ছাইযুক্ত অথচ বেশি কাঠিন্য প্রদানকারী কয়লার সংমিশ্রণ (blending) ঘটালে উপযুক্ত মাত্রার কোক পাওয়া সম্ভব এবং এর দ্বারাও সংরক্ষণের সাফল্য আনা যাবে।

সদ্‌ব্যবহার

ধাতুনিষ্কাশন-উপযোগী কোকিং কয়লা ছাড়াও যেসমস্ত কয়লায় ক্ষীণ কোক তৈরি হয় অথবা একেবারেই কোক হয় না—সেগুলির সদ্‌ব্যবহারের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

নানা স্তর এবং নানা অঞ্চলের কয়লার কোক প্রস্তুতকরণ, তাদের উপজাত-গুলির প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ, বিভিন্ন উপায়ে তাদের উপযুক্ত ব্যবহার, সবই গবেষণার বিষয়বস্তু হিসাবে গণ্য করা হয়।

চাপের তারতম্য ঘটিয়ে উর্ধ্ববাহিত অবস্থায় কয়লার চূর্ণের কারবনিজেশন অথবা গ্যাসীয়করণ প্রক্রিয়া নিয়েও বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়া নন্‌-কোকিং কয়লার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

খনিজ কয়লার অভাব না থাকলেও খনিজ পেট্রোলিয়াম আমাদের দেশে খুব কমই আছে। আমাদের মোট চাহিদার ৭ শতাংশ মাত্র ভারতে উৎপন্ন হয়। পেট্রোলিয়াম ছাড়া আমরা এক পাও চলতে পারি না। মোটর উড়োজাহাজ প্রভৃতি চালাবার জন্ম পেট্রোলিয়াম অত্যাবশ্যক। তাই আজকের পৃথিবীতে এই পেট্রোলিয়ামের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে সভ্য দেশগুলির মধ্যে মন-কষাকষি চলছে। বাঁচবার জন্ম আমরাও এ বস্তু চাই, কিন্তু সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নয়। তাই ঘটিত উপায়ে কয়লার মধ্যে উদজান ঢুকিয়ে আমরা এ বস্তু সংগ্রহের প্রতি যত্নবান হয়েছি। কোক তৈরির অনুপযুক্ত অনেক কয়লাই আমরা এ কাজে নিয়োগ করতে পারি। আলকাতরাও এর জন্ম ব্যবহার করা হয়।

চাপ-সহযোগে লিগনাইট জাতীয় কয়লা ও অন্যান্য গুঁড়া কয়লার মণ্ডক্ (briquette) প্রস্তুত করে ব্যবহার উপযোগী করার সহজ উপায় উদ্ভাবনও এই গবেষণার অঙ্গ।

সস্তায় গৃহকাজের উপযোগী চুলা তৈরি নিয়েও অনেক সাফল্যজনক কাজ
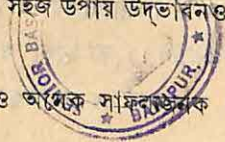
করা হচ্ছে। তা ছাড়াও বিশেষ প্রকার উন্নত দহনের সহায়তায় কয়লার অন্তর্নিহিত তাপশক্তি কতখানি কার্যকরী শক্তিরূপে পাওয়া সম্ভব তা নিয়েও গবেষণা শুরু হয়েছে। বেশি ছাইযুক্ত কয়লাই এই গবেষণার লক্ষ্যবস্তু।

ছাই-বিহীন কয়লা ও কার্বিয়ন প্রভৃতির উৎপাদন-প্রণালী নিয়েও প্রভূত গবেষণা চলছে। এ সম্বন্ধে গবেষণাগারের পেটেন্ট ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

ভারতের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের শিল্পোন্নতি এবং সেসব জায়গার কাঁচামালগুলির উপর দৃষ্টি রেখেই এইসমস্ত গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিন্তু সদ্ব্যবহার করার আগেই প্রথম প্রশ্ন জাগে যার সদ্ব্যবহার করা হবে তার প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ধারণ কি উপায়ে সম্ভব। যথাযথ সমীক্ষা (survey) ছাড়া এর সদুত্তর দেওয়া কঠিন। তাই কয়লা-অঞ্চলগুলির জন্য কতকগুলি কেন্দ্র স্থাপন করে প্রকৃতিগত এবং রাসায়নিক সমীক্ষা আরম্ভ করা হয়েছে। ঝরিয়া রাণীগঞ্জ বোকারো মধ্যপ্রদেশ এবং আসাম অঞ্চলে এই কেন্দ্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন কয়লা-স্তর সম্বন্ধীয় বহুবিধ তথ্য এর দ্বারা উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সমীক্ষা ছাড়াও এই আঞ্চলিক গবেষণাগারগুলি স্থানীয় সমস্যার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে। এই সমীক্ষার কাজে নমুনাগ্রহণ (sampling) বিশেষ যত্ন ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। শহর থেকে দূরে সুদূর কয়লা-অঞ্চলে আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হল এই কঠিন এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা।

মৌলিক গবেষণা

আশু শিল্পোন্নতির প্রতি এর প্রভাব খুব বেশি না থাকলেও এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী। তা ছাড়া অন্যান্য গবেষণায় সভ্যদেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভারতবর্ষ যে মৌলিকত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে, কয়লার গবেষণাতেও তা খুবই

সম্ভবপর। এই মৌলিক গবেষণার সবচেয়ে বড় অবদান হল যে, অন্যান্য দেশের প্রক্রিয়ার বা পন্থার হুবহু নকল না করেও সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের পেটেন্ট আবিষ্কারে সক্ষম হওয়া যাবে।

ভারতীয় কয়লার ভূতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, কয়লার জৈব এবং অজৈব উপাদান-গুলির প্রকৃতি, পরিমাণ এবং কারণ নির্ধারণ, বিভিন্ন প্রকার যৌগিক এবং বিশ্লেষক প্রক্রিয়ার পরীক্ষা ও উদ্ভাবন এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।

এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও দৃষ্টিভঙ্গি যেমন কয়লার গুহার অন্ধকারে জ্যোতির্ময় আলোকের সন্ধান দেবে, তেমনি এই মুমূর্ষু পৃথিবীর মুখে অমৃতের পাত্র তুলে ধরবে।

তাই দৃষ্টি হারালে চলবে না, দৃষ্টি আমাদের চাইই।

স্বীকৃতি

কয়লা নিয়ে কিছু লিখতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। বিষয়ের পাণ্ডিত্যে ও ভাষার জ্ঞানে আমার দৈন্য সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সজাগ। পরিভাষায় আমার কোনো অধিকার নাই। তবু কয়লা-অঞ্চলে থাকা এবং কয়লা নিয়ে সামান্য কাজ করার সুযোগ পাওয়াতেই হয়তো আমার প্রাক্তন অধ্যাপক বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়ার জন্য আমাকে উৎসাহ দেন। কয়লা-অঞ্চল থেকে দূরে থেকেও কয়লা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছি। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তাঁকেই সর্বাগ্রে দেখাই। তাঁরই নির্দেশক্রমে 'কয়লার উৎপাদন' অধ্যায়টি সংযোজনা করেছি।

পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে এটিকে পুস্তকাকারে মুদ্রণের জন্য খ্যাতনামা জ্বালানিতত্ত্ববিদ্ ডক্টর আদিনাথ লাহিড়ী আমাকে উৎসাহিত করেছেন। 'কয়লার সদ্‌ব্যয়' অধ্যায়টি লেখার অনুপ্রেরণা তাঁর কাছেই পেয়েছি। 'কয়লার অপচয়' ও 'কয়লার গবেষণা' অধ্যায় দুইটিতে তাঁর রচিত কয়েকটি পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

শঙ্করপুর কোলিয়ারির ম্যানেজার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমোহন সামন্ত বিশেষ যত্ন ও ধৈর্যের সঙ্গে পুস্তিকাখানি প'ড়ে তথ্যাবলী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংশোধন করে দিয়েছেন।

—লেখক